ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হল সময়ের সাথে সাথে রূপ বদলায় এবং এক সময় চাপা পরে যায়। আর জ্ঞানপিপাসু মানুষের বৈশিষ্ট্য হল মাটি খুঁড়ে হলেও তারা ইতিহাস খুঁজে বের করে এবং এর আসল রূপ না দেখা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না।

-শাহীদুল বারী মামুন

বইঘর
Boighor, 5, CDA, C/A
ahar,Chattogram, Bangladesh.
danboighor@gmail.com
978-984-96809-8-7

বাংলায় প্রথম সাহাবী ▼ শাহীদুল বারী মামুন

বইঘর

বাংলায় প্রথম সাহাবী

শাহীদুল বারী মামুন



বাংলায় আগত প্রথম সাহাবী কে? প্রশ্নটি সহজ হলেও এর উত্তরের শেকড় ইতিহাসের অনেক গভীরে এবং তা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিপরীতমুখী। যার কারণে একটি সত্য প্রকাশের প্রয়াস থেকেই এই গ্রন্থ রচনা।

প্রয়োজনের তাগিদে এই বইতে মূল বিষয়বস্তুর পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে প্রচীন আরব ও ভারতবর্ষের যোগাযোগের ইতিহাস, আরব বণিকদের দুঃসাহসী নৌযাত্রা এবং সমৃদ্ধ বাংলায় তাঁদের বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার, সাহাবীদের দেশত্যাগী জীবন এবং হজরত মোহাম্মদের (স) জীবদ্দশায় এই বাংলায় তাঁদের আগমনের কিছু খন্ডচিত্র।

পরিশেষে এই গ্রন্থটির পাঠকগণ রোমাঞ্চকর ইতিহাস ভ্রমণের পাশাপাশি নানা তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে জানতে পারবেন বাংলায় আগত প্রথম সাহাবীর প্রকৃত নাম।

প্রচ্ছদ: মোঃ জোবায়ের শেখ

md. shafiul-Alam

বাংলায় প্রথম সাহাবী

শাহীদুল বারী মামুন

পড়া শুরু
Sep, 25, 2023
7.34 pm (রাত)

পড়া শেষ
12 Oct, 2023
9:30 Am

বইঘর
নন্দন বইঘর

বাংলায় প্রথম সাহাবী
শাহীদুল বারী মামুন

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০২৩
প্রকাশক :
নন্দন বইঘর
৫ সিডিএ বা/এ, নিমতলা, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮২০-০২৪০৫৩

প্রচ্ছদ :
মো. জোবায়ের শেখ

মুদ্রণে :
স্বপ্নরং
লুসাই ভবন, নিমতলা চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম।

মূল্য : ২০০ টাকা

BANGLAY PROTHOM SAHABY
By Shahidul Bari mamun
by Nandan Boighor, 5, CDA, C/A
Nimtala, Cheragi Pahar, Chittagong, Bangladesh, Price : 200 Taka.
e-mail : nandanboighor@gmail.com

ISBN : 978-984-96809-8-7

এই বই বিক্রয় থেকে লেখকের প্রাপ্য সমুদয় অর্থ মসজিদ উন্নয়নে ব্যয় করা হবে

উৎসর্গ

বাবা মরহুম আব্দুল বারী সরকার ও বড় ভাই মরহুম রেজাউল বারী।
এই বইটি প্রকাশে যে দুজন মানুষ সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন।
করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এই বইটি কবুল করেন
এবং এর জন্য মরহুমদের আরও অপার্থিব কল্যাণ দান করেন।

কৃতজ্ঞতা...

এই বইটির সাথে জড়িয়ে আছে এক ভিন্নসত্তা এবং অনেকগুলো প্রাণ। যাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং আজীবন ঋনী। ভিন্নসত্তা হচ্ছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, এই বইটি যার দয়ার প্রতিফলন। জ্ঞানের দৈন্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকার পরেও 'বাংলায় প্রথম সাহাবী' বইটি লেখার কাজে হাত দিয়েছি শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে; তাঁর দয়া ব্যতিত এই বইটি লেখার শুরু বা শেষ কোনটিই হতো না। অনেকগুলো প্রাণের অন্যতম আমার সহধর্মিনী রাজিয়া সুলতানা মনি এবং কন্যা মসনভি-ই-মা'নাভি, বইটি লেখাকালীন প্রাপ্য সময় থেকে তাদের বঞ্চিত করেছি। কর্মক্ষেত্রে অগ্রজ জনাব শরীফুল আলম ভাই, তাঁর একটি কথার প্রেক্ষিতে মনে হয়েছিল বইটি লেখা প্রয়োজন। বোন খাইরুন নাহার হীরা এবং নূর হোসেন ভাই যাদের কাছে নিয়মিত তাগিদ পেয়েছি বইটি লেখার। খালেদ সাইফুল্লাহ ভাই, যিনি বেশ কিছু দুর্লভ বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন রেফারেন্সের জন্য। উল্লেখিত রেফারেন্স বইগুলোর লেখক/ অনুবাদক, যাদের শ্রমের ফসল থেকে বীজ নিয়ে নতুন ফসল ফলিয়েছি। ৬৯ হিজরিতে নির্মিত সাহাবী মসজিদের (লালমনির হাট) আবিষ্কারক জনাব আইয়ুব আলী সাহেব, তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে তাঁর সাক্ষাতের জন্য গেলে দুপুরবেলা তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে খাইয়েছেন, পরম মমতায় ভাতের থালায় তুলে দিয়েছেন গরুর মাংস আর করলা ভাজি। আমি কতো ভাবেইনা ঋনী এই মানুষগুলোর কাছে, যে ঋন কখনও শোধ করা সম্ভব নয়। আসলে ভালোবাসার ঋন কখনও শোধ হয় না, সুদে আসলে চাক্রবৃদ্ধি হারে ক্রমশ বাড়তে থাকে।

কিছু কথা...

একটি প্রশ্নের উত্তর জানার এবং জানানোর আকুতি থেকেই এই বইটির জন্মপ্রকৃয়া শুরু। বাংলায় আগত প্রথম সাহাবী কে? মাত্র পাঁচ শব্দের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বুঝলাম এর উত্তরের শেকড় অনেক গভীরে এবং এর সঠিক উত্তর প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিপরীতমুখী। মনে হলো, যারা একই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষী তাদেরকেও জানানো প্রয়োজন। লেখা শুরু করার পর বুঝলাম কাজটি বেশ কঠিন; কিন্তু কিছু কাজ থাকে যা শুরু করলে পেছনে ফেরার আর কোন সুযোগ থাকে না। বইটির লেখার ক্ষেত্রে এ সুযোগ খোঁজারও চেষ্টা করিনি।

ইতিহাসের প্রয়োজনে এই বইতে মূল বিষয়বস্তুর পাশাপাশি সংযুক্ত হয়েছে আরও তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে প্রচীন আরব ও ভারতবর্ষের আদিম যুগের সূচনা এবং এর যোগাযোগে ইতিহাস। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম সভ্য মানব-মানবীর পৃথিবীতে অবতরণ থেকে শুরু করে বংশ বিস্তার এবং তাঁদের বংশধরদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরার প্রেক্ষাপট।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে প্রাক-ইসলামিক যুগে শুরু হওয়া আরব বণিকদের বাণিজ্যযাত্রা ও সমৃদ্ধ বাংলায় তাঁদের বাণিজ্যের ইতিহাস। যেখানে উপস্থাপন করা হয়েছে বাণিজ্য যাদের সম্ভ্রান্তের প্রতীক, বাণিজ্য যাদের রক্তে মিশে থাকে এমন আরব বণিকদের আরব-চীন পথে দুঃসাহসী বাণিজ্যযাত্রার কিছু খন্ডচিত্র। এছাড়া প্রাচীন বাংলার উপচে পড়া সমৃদ্ধির এবং এখানে বণিকদের সতঃফূর্ত আগমন ও বাণিজ্যের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে সাহাবীদের ধর্মের জন্য দেশত্যাগী জীবন এবং হজরত মোহাম্মদের (স) জীবদ্দশায় এই বাংলায় তাঁদের আগমন এবং ধর্ম প্রচারের কিছু দৃশ্য। কোন উদাহরণ বা প্রমান ছাড়াই শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যাঁরা শুধু ধর্মের জন্য শূন্য হাতে গৃহত্যাগী হয়েছেন, পরিবার বা গৃহবিচ্ছেদের যন্ত্রনা যাঁদের পথ রোধ করতে পারেনি এমন কিছু সাহাবীদের দেশত্যাগী জীবনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। শুধু তাই নয়, হজরত মোহাম্মদের (স) জীবদ্দশায় জন্মভূমি থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে এই বাংলায় যাঁরা এসেছেন ধর্মের বাণী নিয়ে তাঁদের কথাও বর্ণিত হয়েছে হয়েছে এখানে।

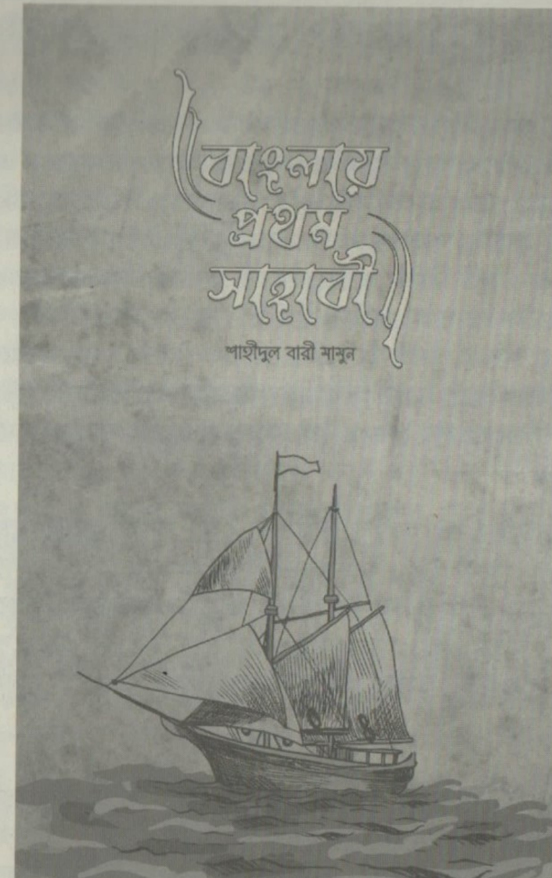
সর্বশেষ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে এই বাংলায় আগত প্রথম সাহাবীর প্রকৃত নাম। তাঁর নাম নিয়ে বিভ্রান্তির সম্ভব্য কারণ এবং এর অবসান।

আগেই বলেছি, জ্ঞানের দৈন্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকার পরেও যেহেতু

লেখার কাজে হাত দিয়েছি; সেকারণে শ্রমের পরিমানও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। পেশাগত কাজের বাহিরে অবসরে বেশকিছু রেফারেন্স বই পড়তে এবং কয়েকটি প্রাচীন স্থাপনা ও জাদুঘরে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে বইটি তথ্যবহুল ও নির্ভুল করার জন্য। এর পরেও যদি কোন ভুল থেকে যায় উদার হৃদয়ের পাঠকরা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এই আশাই লালন করি। পরিশেষে এটুকুই বলে রাখা, এই বইয়ের একটি তথ্যও যদি কারো কোন কল্যাণে আসে তাহলে পরিশ্রম স্বার্থক হবে বলে মনে করি। করুণাময় আমাদের কবুল করুক।

শাহীদুল বারী মামুন
জানুয়ারি ২০২৩, বান্দরবান

সূচীপত্র



প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আরব, যোগসূত্র যেখানে

প্রথম সভ্য মানব-মানবীর পা যেদিন পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছিল সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আরবের ইতিহাস; কারণ তাঁরা অবতরণ করেছিলেন প্রাচীন আরব এবং এই ভারতবর্ষেই। তাই ভারতবর্ষ এবং আরবের ইতিহাস পৃথিবীর আর যেকোন দেশের ইতিহাসের চেয়ে প্রাচীন এ নিয়ে কারো কোন সন্দেহ নেই।

পৃথিবীতে সভ্য মানুষ আসার আগে আল্লাহ যখন তাঁর প্রতিনিধি সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি হজরত আদম (আ) এবং হাওয়াকে (আ) সৃষ্টি করলেন এবং তাঁদের জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত দান করলেন। তাঁরা তাঁদের ইচ্ছে মতো দিন কাটাতে লাগলেন; কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য একটি নির্দেশনা ছিল, জান্নাতের বাগানে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল না খাওয়া; কিন্তু শয়তানের কুমন্ত্রণায় তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ ভুলে গেলেন এবং ঐ গাছের ফল খেলেন। যার কারণে তাঁদের জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়ায় আদম (আ) অবতরণ করেন প্রাচীন ভারতবর্ষের দক্ষিণে সরণদ্বীপ বা শ্রীলঙ্কার 'নূয়' নামের একটি সুউচ্চ পর্বতের চূড়ায়; অপর দিকে হজরত হাওয়া (আ) অবতরণ করেন আরবের বর্তমান জেদ্দা বন্দরের কাছে।[১]

পৃথিবীতে অবতরণের পর হজরত জিবরাঈল (আ) সাতটি গমের বীজ আদমকে (আ) এনে দেন। আদম (আ) বীজগুলোর বিষয়ে জানতে চাইলে জিবরাঈল (আ) বলেন, "এই সেই নিষিদ্ধ ফল যা আপনি জান্নাতে খেয়েছেন, এগুলো জমিনে বপন করুন।" আদম (আ) গমের বীজগুলো বপন করলেন এবং সেখান থেকে ফলস উৎপন্ন হলে গমের আটার রুটি বানিয়ে খেলেন। পৃথিবীতে এটাই ছিল তাঁর প্রথম খাবার।[২]

আল্লাহর নির্দেশে জিবরাঈল (আ) আদমকে (আ) নিয়ে আরবের আরাফার ময়দানে যান এবং সেখানে তিনি হাওয়ার (আ) দেখা পান। তাঁদের সাক্ষাতের তারিখ নিয়ে ইতিহাসে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের ধারণা অনুমানিক ৩০০ থেকে ৩৫০ হবুতি বর্ষের মাঝামাঝি সময়ে আদম (আ) এবং হাওয়া (আ) আরাফার ময়দানে একত্রিত হন। আদম (আ) প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষ থেকে পায়ে হেটে আরবে গিয়েছিলেন; তাই বলা যেতে পারে ভারতের সাথে আরবের যোগাযোগের সূচনা করেছিলেন পৃথিবীর প্রথম সভ্য মানুষ আদম (আ)। আদম (আ) এবং হাওয়া (আ) উভয়ের সাক্ষাত প্রাপ্তির পর থেকে তাঁরা আরবের মক্কাতে বসবাস করতে থাকেন। আদম (আ) আনুমানিক ৯৩০ হবুতি

বর্ষে ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর বংশধরের সংখ্যা নিয়ে ইতিহাসবিদদের কেউ বলেন চার হাজার আবার কেউ বলেন চল্লিশ হাজার, তবে ইবনে কাসিরের মতে প্রায় চার লক্ষ।[৩]

আদমের (আ) বংশধরেরা বিভিন্ন সময় আরবের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতে শুরু করে এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে পুত্র কাবিল সর্বপ্রথম আরবের বাইরে বসবাস করে। ঐ সময় আল্লাহর ইচ্ছায় হাওয়ার (আ) প্রতিবার যমজ সন্তান হতো এবং সে সময়ের শরিয়ত অনুসারে এক জোড়ার ছেলের সাথে অন্য জোড়ার মেয়ের বিয়ে হতো। সেই অনুসারে প্রথম জোড়ার ছেলে কাবিলের সাথে দ্বিতীয় জোড়ার মেয়ে লুবজা এবং প্রথম জোড়ার মেয়ে আকলিমার সাথে দ্বিতীয় জোড়ার ছেলে হাবিলের বিয়ে হওয়ার কথা; কিন্তু আকলিমা লুবজা অপেক্ষায় অধিক সুন্দরী হওয়ায় কাবিল লুবজার পরিবর্তে আকলিমাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়। এর ফয়সালা করার জন্য আদম (আ) তাদের কোরবানি করার নির্দেশ দেন। পিতার নির্দেশ মোতাবেক হাবিল একটি মোটাতাজা বকরি এবং কাবিল তার নিজের উৎপাদিত শস্য কোরবানির জন্য নির্ধারণ করলে আগুন এসে বকরিকে গ্রাস করে। হাবিলের কোরবানি কবুল হয় এবং কাবিলের কোরবানি পরিত্যক্ত হয়।[৪] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআনে বলেন- "হে নবী! কিতাবিগণকে আদমের দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের ঘটনা ভালো করে বর্ণনা করো। তারা যখন কোরবানি করেছিল, তখন একজনের কোরবানি কবুল হলো কিন্তু অন্যজনের কোরবানি কবুল হলো না। ক্ষিপ্ত হয়ে সে বলল, আমি তোমাকে খুন করব। অপরজন বলল, প্রভু তো শুধু আল্লাহ- সচেতনদের কোরবানিই কবুল করেন।"[৫] কোরবানি কবুল না হওয়ার ক্ষোভ এবং আকলিমাকে পাওয়ার আশায় কাবিল তার পিতার অনুপস্থিতিতে ছোট ভাই হাবিলকে দামেস্কের উত্তরে কাসিয়ান পাহাড়ের গুহায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। স্থানীয় লোকজন এখনও এই পাহাড়কে রক্তের পাহাড় বলে থাকে এবং এখানে অবস্থিত ১৯ মিটার লম্বা একটি কবরকে হাবিলের কবর বলে অনেকের ধারণা করে।[৬] হাবিলকে হত্যার পর কাবিল পিতার ভয়ে পালিয়ে বর্তমান ইয়ামেনের ইডেন বন্দরের পূর্বংশে নুদ অঞ্চলের কিন্নীরে কিছুকাল বসবাস করে। সেখানে খানূখ নামে তার একটি সন্তান হয়।

আদমের (আ) জীবনের শেষের দিকে অসুস্থতার সময় তাঁর পাঁচ পুত্র ওয়াদ, সুয়া, ইয়াউক, ইয়াগূস ও নসর তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলের। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক ঈশ্বরবাদী ও সৎকর্মশীল; তাঁদের মধ্যে ওয়াদ ছিলেন সবার বড় এবং সবচেয়ে সৎ, যার কারণে অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করতেন। ওয়াদ মারা যাওয়ার

পর তাঁর ও তাঁর ভাইদের কওমের লোকজন কবরের কাছে কান্নাকাটি করতে থাকে। শয়তান এই সুযোগে মানুষের কাছে এসে তাদের প্ররোচিত করার জন্য বলে, "আমি তোমাদের এই বুযুর্গের মূর্তি তৈরি করে দিচ্ছি তা সামনে রেখে দাও, যাতে তোমরা তাঁকে ভুলে না যাও।" লোকজন তাই করল এবং এর কিছু দিন পার শয়তান তাদের আবারো বলে, "একটি মূর্তির কাছে সবাইকে আসতে হয়ে যা খুবই কষ্টকর, আমি তোমাদের অনেকগুলো মূর্তি তৈরি করে দিচ্ছি, যাতে তোমরা তা নিজেদের বাড়িতে রাখতে পারো।" সবাই তাই করলো এবং সে থেকেই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা হয়। এই এক ঈশ্বরবাদী সৎকর্মশীল ব্যক্তি ওয়াদের আরেক নাম ছিল শীষ (আ)।[৭]

প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় হজরত শীষ (আ) তাঁর জীবদ্দশায় বেশকিছু বছর এই ভারতবর্ষে অবস্থান করেছেন। ভারতের অযোধ্যায় তার একটি রূপক মাজার এখনও বিদ্যামান। সম্ভবত হজরত শীষকে (আ) ভারতবর্ষে দেবতা শিব হিসেবে মান্য করা হয়।

আদমের (আ) ওফাতের ১০ যুগ পর জন্মগ্রহণ করেন হজরত নূহ (আ); তিনি ছিলেন আদমের (আ) দশম অধস্তন বংশধর।[৮] তাওরাত এবং পবিত্র কুরআনে বহুবার বর্ণিত নূহ (আ) বসবাস করতেন বর্তমান দক্ষিণ ইরাকের কুফা নগরীর কাছাকাছি। তাঁর সময় মানব বসতি দাজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল এবং এই দুই নদীর মধ্যবর্তী জল প্লাবিত এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে নূহের (আ) কওমের জনবসতি ছিল; যা বর্তমান বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় সমান। নূহ (আ) সেখানে সাড়ে নয়শত বছর সত্যধর্ম প্রচার করেছেন কিন্তু তাঁর তিন সন্তান সাম, হাম এবং ইয়াফেস সহ মাত্র অল্প কিছু মানুষ আল্লাহর একাত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন। নূহের (আ) প্রচারিত ধর্মগ্রহণকারীর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে; তবে এর সংখ্যা ২৫ এর কম বা ৮০ এর বেশি নয়।[৯]

নূহের (আ) কওমের অন্যরা অন্ধভক্তি এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে ওয়াদ, সুয়া, ইয়াউক, ইয়াগূস ও নসরের মূর্তি উপাসনা করতে থাকে।[১০] এর থেকে পরিত্রানের জন্য নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে একটি কাঠের নৌকা নির্মাণ করেন এবং সেখানে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং প্রতিটি প্রাণী এক জোড়া করে উঠিয়ে নেন। এরপর শুরু হয় মহাপ্লাবন, এতে তাঁর নৌকায় অবস্থানকারী ছাড়া সবাই পানিতে ডুবে যায়।

এ প্রসঙ্গে কোরআনে পাওয়া যায়- "অবশেষে আমার নির্দেশে জমিন থেকে স্রোতের মতো পানি উঠতে লাগল, প্লাবন শুরু হলো। আমি নূহকে বললাম, প্রত্যেক জীব থেকে এক জোড়া করে জাহাজে ওঠাও। যাদের শাস্তি স্থির হয়ে আছে তাদের ছাড়া পরিবারের সকল সদস্য এবং বিশ্বাসীদের নিয়ে জাহাজে আশ্রয় নাও। অবশ্য খুব কমসংখ্যক মানুষই নূহকে বিশ্বাস করেছিল।"[১১]

হজরত নূহের (আ) নৌকা ৪০ দিন ভাসার পর বর্তমান টাইগ্রীস নদীর পূর্ব তীরে ইরাক, সিরিয়া ও তুর্কী সীমান্তে জুদি পর্বতে গিয়ে পৌছায়।[১২]

হজরত নূহ (আ) একটি কাক পাঠান পানির অবস্থা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। কাকটি যদি ফেরত আসে তাহলে ধরে নিতেন পানি নেমে যায়নি; যার কারণে কাকটি বসার কোন জায়গা না পেয়ে ফিরে এসেছে। আর যদি ফেরত না আসে তাহলে ধরে নিতেন পানি নেমে গেছে; যার কারণে কাকটি কোথাও বসেছে তাই ফেরত আসেনি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর কাকটি ফেরত না আসায় তিনি এবার একটি কবুতর পাঠান। কবুতরটি মুখে করে জলপাইয়ের পাতা নিয়ে ফেরত আসে; এতে নূহ (আ) বুঝলেন পানি নামতে শুরু করেছে। তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবারো সেই কবুতর পাঠালেন, কিন্তু এবার সেটি আর ফিরে আসেনি; এতে তিনি নিশ্চিত হন পানি পুরোপুরি নেমেছে। সম্ভবত এই কারণেই ইউরোপের দেশেগুলোতে জলপাইয়ের পাতাকে শান্তি ও আশার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নূহের (আ) ঘটনা সনাতন ধর্মের ষোড়শ পুরাণ মৎসপুরাণেও উল্লেখ পাওয়া যায়, "বিষ্ণুর প্রথম অবতার মৎস অবতারের সমকালীন ব্রহ্মের মানসপুত্র ও আদি মানব মনু অভিভূর্ত হয়। মনু গভীর তপস্যায় মগ্ন থাকাকালীন একটি ক্ষুদ্র মাছ তার কাছে আশ্রয় চায়। তিনি তাকে আশ্রয় দিলে মাছটি দ্রুত বড় হতে থাকে। পুকুর বা জলাশয়ের কোথাও মাছটির পর্যাপ্ত জায়গা না হওয়ায় মনু মাছটিকে সমুদ্রে রেখে আসেন। এরপর সত্যযুগে অযাচার বেড়ে গেলে মনু একটি প্রকান্ড নৌকা নির্মাণ করেন। তিনি এ নৌকায় সপ্তঋষিগণ এবং প্রানী জগতের এক জোড়া করে প্রানী তুলে নেন। কিন্তু তার প্রকান্ড নৌকাটি অতিরিক্ত ভারে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে একটি মাছ নিজের পিঠে উঠিয়ে মনুর নৌকা ভাসিয়ে রাখে। মহাপ্লাবন শেষে বিষ্ণু তার মৎস রূপধারণ করে প্রানীকুল রক্ষা করার কথা প্রকাশ করেন। মহাপ্লাবনে সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মহাপ্লাবনের পর নতুন মনুষ্য সভ্যতা গড়ে ওঠে।"[১৩]

সবাই নৌকা থেকে নামার পর আল্লাহ নূহকে (আ) প্রতিশ্রুতি দেন এরূপ মহাপ্লাবন তিনি পৃথিবীতে আর কখনো দেবেন না এবং এই প্রতিশ্রুতির

নিদর্শনস্বরূপ মেঘের মধ্যে রংধনু স্থাপন করেন। ইবনে আব্বাসের (রা) মতে রংধনু হলো নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।[১৪] এই মহাপ্লাবনের পর নূহের (আ) তিন ছেলের বংশধর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করে। যে এলাকায় যারা বসতি স্থাপন করে তাদের নাম অনুসারে সে এলাকার নামকরণ করা হয়। বর্তমান সময়ের বিশ্বের সব মানুষ তাদেরই বংশধর; যার কারণে নূহকে (আ) বলা হয় দ্বিতীয় আদম।[১৫]

নূহের (আ) পুত্র সাম পৃথিবীর মধ্যভাগে এসে বসবাস করতে শুরু করেন তাঁর নাম অনুসারেই 'সেমিটিক' শব্দটির নামকরণ হয়েছে। বর্তমান 'সেমিটিক' বা 'সামীয়' জাতি তাঁরই বংশধর। সামের ছিল পাঁচ পুত্র- ইলাম, আরফাখশাজ, লুদ, আশুর ও আরাম।[১৬] মক্কা ও এর আশেপাশের এলাকা ছাড়াও ইয়মেন, হাদরামাউত, ওমান, বাহরাইন, আলিজে, ইয়ারিন, উবার, দাওয়ে এবং দাহনায় তাঁদের সন্তানেরা বসবাস করতে থাকে।[১৭] পরবর্তীতে তারা উর্বর সবুজ ভূমির খোঁজে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পরে। আরব এলাকা থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে তারা ছড়িয়ে পরা শুরু করে এবং বাবেল, মিসর ও কেনান পর্যন্ত বসবাস করতে শুরু করে। দ্বিতীয় দফায় খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে সামের বংশধর বনূ আদুমি, বনূ মাওআবি ও বনূ মাদযানি নিজ এলাকা ছেড়ে আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পরার পর মায়িন এবং সাবার গোত্রগুলো আশেপাশের দেশগুলোয় ছড়িয়ে পরে। সেমেটিক অর্থাৎ সামের বংশধররা সর্বশেষ ছড়িয়ে পরে হিজরি প্রথম শতকে অর্থাৎ ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে; তবে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পুরুষদের মতো উর্বর সবুজ ভূমি খোঁজা নয়, ছিল ধর্ম প্রচার। আর এজন্য তাঁরা ছড়িয়ে পরেছিল প্রথমে ভারতবর্ষ তারপর পৃথিবীব্যাপি।[১৮] নূহের (আ) ছেলে ইয়াফিজের ছিল সাত ছেলে; তারা হলেন- জুমার, মাজুজ, মাদাই, ইয়াওয়ান, তুবান, মাশাক ও তিরাস। তারাও বিভিন্ন সময় পৃথিবীব্যপি ছড়িয়ে পরে। রোমান এবং এর আশেপাশের জাতিগোষ্ঠী সবাই ইয়াফিজের বংশধর।

নূহের (আ) আরেক পুত্র হাম তৎকালীন পৃথিবীর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁর নাম অনুসারেই 'হেমেটিক' নামকরণ হয়েছে; বর্তমান 'হেমেটিক' বা 'হামীয়' জাতি তাঁরই বংশধর। হামের ছিল ছয় পুত্র - সিন্দ, হিন্দ, হাবাস, জানাস, বার্বার ও নিউবাহ। তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের নাম অনুসারেই তাদের জাতি এবং ঐ এলাকার নামকরণ হয়।

হিন্দের ছিল চার পুত্র- পূরব, বঙ, দাকন ও নাহরাওয়াল। প্রথম পুত্র পূরবের ঔরসে জন্ম নিয়েছিল বিয়াল্লিশ জন পুত্র; তারা খুব কম সময়ের মধ্যে বংশবিস্তার করে এক স্থানে স্থায়িভাবে না থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে। হিন্দের তৃতীয় পুত্র দাকন তার বংশধরদের নিয়ে বসবাস শুরু করে দক্ষিণ অঞ্চলে; যার কারণে বর্তমান ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলকে দাকন বলা হয়। দাকনের ছিল তিন পুত্র-সারহাট, কানাড় ও তালুঙ। তারা যে এলাকায় বসবাস শুরু করে সে এলাকার নামগুলো হয় তাদের নামে। সারহাটের নাম অনুসারে ঐ এলাকার নাম হয় সুড়াট, কানাড়ের নাম অনুসারে ঐ এলাকার নাম হয় কানাড়ি, এবং তেলেগু বা তেলেঙ্গ নামকরন হয় তালঙ্ এর নাম অনুসারে। হিন্দের চতুর্থ পুত্র নাহরাওয়ালের ছিল তিন পুত্র- বাবরুজ, কনোজ ও মালরাজ। তাদের নাম অনুসারেই ঐ এলাকার নামকরন হয়েছে বাবরুজ, কনৌজ ও মালরাজ।

হিন্দের দ্বিতীয় পুত্র বঙ্ তাঁর বংশধরদের নিয়ে এই উপমহাদেশের পুর্বাঞ্চলের জলাভূমিতে বসবাস করেন এবং তাঁর নাম অনুসারেই এই এলাকার নাম বঙ্গ। এই বঙ্গ এলাকাটি বসবাসের উপযোগী এবং জনবসতীপূর্ণ করেন নূহের (আ) প্রপৌত্র বঙ্ এবং তাঁর বংশধররা।[১৯]

মুসলিম ইতিহাসবিদদের রচিত প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ যেমন, তারিখ-ই-ফিরিশতা, রিয়াজ উস-সালাতীন, তারিখ-ই-কাবির ইত্যাদিতে বঙ্ ও তাঁর সন্তানদের এই দেশে বসবাস এবং বঙ্ এর কারণে এ জনপদের নামকরণ বঙ্গ হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সনাতন ধর্মালম্বী ইতিহাসবিদগণ ভিন্নমত পোষণ করেন; তাদের মতে 'বঙ্গ' শব্দটির উৎপত্তি খ্রিষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে যখন আর্যরা পূর্ব ভারতের সিন্ধু নদের তীরে এসে বসবাস শুরু করে তখন থেকে। ইতিহাসবিদ ও ধর্মপণ্ডিত রাখাল দাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করতেন 'বঙ্গ' শব্দটির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যকে। এছাড়া পরবর্তীতে বৌধায়ন ধর্মসূত্র, রামায়ন, পুরাণ, হরিবংশ ও মহাভারতে 'বঙ্গ' শব্দটি পাওয়া যায়।

আর্যদের মহাভারতে পাওয়া যায়- 'উতথ্য ঋষির পত্নী মমতা গর্ভিনী থাকাকালীন তার দেবর বৃহস্পতি সঙ্গম প্রার্থনা করেন। মমতার নিষেধ না শুনে বৃহস্পতি বলপ্রয়োগে উদ্যত হলেন, তখন গর্ভস্ত শিশু তার পা দিয়ে পিতৃব্যের চেষ্টা ব্যর্থ করল। বৃহস্পতি শিশুকে শাপ দিলেন, তুমি অন্ধ হবে। উতথ্যের পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হলো দীর্ঘতমা। তিনি ধার্মিক ও বেদজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু গোধর্ম (পশুতুল্য যত্রতত্র সঙ্গম) অবলম্বন করায় প্রতিবেশী মুনিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে

তাঁকে ত্যাগ করলেন। দীর্ঘমতমার পুত্রেরা মাতার আদেশে পিতাকে ভেলায় চড়িয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন। ধর্মাত্মা বলী রাজা তাকে দেখতে পেয়ে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়ে গেলেন এবং মহিষী সুদেষ্ণনাকে তার কাছে যেতে বললেন। সুদেষ্ণনা নিজে গেলেন না, তার ধাত্রীকন্যাকে পাঠালেন। সেই শূদ্র কন্যার গর্ভে কাক্ষীবান প্রকৃতি এগারজন ঋষি উৎপন্ন হয়। তারপর রাজার নির্দেশে সুদেষ্ণনা স্বয়ং গেলেন, দীর্ঘতমা তার অঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, তোমার পাঁচটি তেজস্বী পুত্র হবে- অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুক্ষ্ম। তাদের দেশও এই সকল নামে খ্যাত হবে। বলি রাজার বংশ এইরূপে মহর্ষি দীর্ঘতমা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল।[২০]

বলি রাজের মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া বিশাল সাম্রাজ্য তার পাঁচ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয় এবং তাদের পাঁচ জনের নামে পাঁচটি রাজ্য গড়ে ওঠে। মহাভারতে উল্লেখিত এই উপাখ্যান থেকে ধারণা পাওয়া যায় বর্তমান বাংলাদেশ ও আশেপাশের অঞ্চলগুলো অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুক্ষ্ম এই পাঁচটি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল।'[২১]

তখন প্রাচীন ভারতবর্ষ ষোলটি জনপদে বিভক্ত ছিল, আর অঙ্গরাজ্য ছিল প্রাচীন ভারতেরর্ষের এই ষোড়শ জনপদের অন্যতম জনপদ। মহানন্দা নদীর পশ্চিম তীর থেকে কোশী নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত ছিল এর রাজ্যসীমা। তৎকালীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল চম্পা, যা বর্তমানে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ। অঙ্গরাজ্য গুপ্ত বংশ শাসনামলে তীরভুক্তি নামে পরিচিত ছিল এবং এই তীরভুক্তি নামটি পরিবর্তিত হতে হতে ত্রিহুত হয়েছে। বঙ্গে প্রবেশের পথে অবস্থান হওয়ার কারণে একে বঙ্গদ্বার বলা হতো।

হিন্দু পুরান, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধসূত্র অনুসারে ভারতের পূর্ব উপকূলে বৈতরনি নদী থেকে গোদাবরি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কলিঙ্গ রাজ্য। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মগধের নন্দবংশের প্রথম রাজা মহাপদ্মনন্দ কলিঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে নিজের রাজ্য বিস্তার করেন। কলিঙ্গের বর্তমান নাম উড়িষ্যা যা বর্তমান ভারতের একটি প্রতিষ্ঠিত রাজ্য।

সুক্ষরাজ্য প্রাচীনকালে রাঢ় নামেও পরিচিত ছিল। রাঢ় রাজ্যের ভিতর দিয়ে অজয় নদ প্রবাহিত হওয়ায় এই রাজ্য উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর রাঢ় ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং রাজা শশাঙ্কের সময় এর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। দক্ষিণ রাঢ় ছিল ভগীরথী নদীর তীরে। মহাভারত এবং পূরাণ সমূহে সুক্ষ বা রাঢ় রাজ্যের বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের অন্যতম চরিত্র ভীম পূর্বদেশ বিজয় অভিযানে বঙ্গ রাজাকে পরাজিত করার পর

তাম্রলিপ্তি ও সুক্ষ রাজাকে পরাজিত করেন। এ থেকেই ধারণা করা হয় সুক্ষ বা রাঢ় রাজ্য তাম্রলিপ্তির কাছাকাছি অর্থাৎ সমুদ্রনিকটবর্তী রাজ্য ছিল।[২২]

পুন্ড্রবর্ধনের অবস্থান ছিল বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের বগুড়ার মহাস্থানগড়ে। এটি ছিল পুন্ড্ররাজ্যের রাজধানী এবং পুন্ড্রবর্ধনের আশেপাশের এলাকা অর্থাৎ বগুড়ার আশেপাশের জেলাগুলো নিয়ে গঠিত ছিল প্রাচীন পুন্ড্ররাজ্য। বঙ্গরাজ্যের উত্তরে হওয়ায় পুন্ড্ররাজ্য উত্তরবঙ্গ নামেও পরিচিত। গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর জৈনের সময়ে ধর্মপ্রচারকরা পুন্ড্ররাজ্যকে ধর্ম প্রচারের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেছিলেন। মৌর্য শাসনামলে বঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের রাজা চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে ছিল এবং রাজা চন্দ্রগুপ্তের কুলগুরু ছিলেন জৈন ধর্ম প্রচারক আচার্য ভদ্রবাহু। তিনিই পুন্ড্রের রাজধানীর নাম পুণ্ড্রবর্ধন রাখেন এবং সেখান থেকে ব্যাপক ভাবে জৈন ধর্ম প্রচার করতে থাকেন।[২৩] জৈন ২২তম তীর্থংকর অরিষ্ট নেমি বা নেমিনাথ অঙ্গ, বঙ্গ ও পুণ্ড্র ভ্রমণ করে ধর্ম প্রচার করেন। ভ্রমণকালে সাথে ছিলেন তাঁর শাসনদেবী অম্বিকা। ঐ সময় তীর্থংকরদের সাথে শাসনদেবীদেরও পূজা করা হতো; যার কারণে পুণ্ড্রে দীর্ঘদিন অম্বিকা দেবীর মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল।[২৪] চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় এসে পুণ্ড্র ভ্রমণ কালে পুণ্ড্রবর্ধনে ২০টি সংঘরাম অর্থাৎ বৌদ্ধ বিহার এবং এতে ৩০০০ জন পুরোহিত বসবাস করতে দেখেছেন। তাঁর বর্ণনামতে এখানে মহাজান ও হীনযান দুই মতবাদের সমান চর্চা চালু ছিল; এছাড়া এখানে শতাধিক দেব মন্দির ছিল।[২৫] জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বেশকিছু প্রচীন গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এখনও মহাস্থানগড়ের জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[২৬]

প্রাচীন কালে বঙ্গের সীমানা ছিল পশ্চিমে ভগীরথী, উত্তরে গঙ্গা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর। গঙ্গার দুই মূলধারা ভগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী এলাকাটি ছিল আসল বঙ্গ। বঙ্গের এক অংশের নাম ছিল 'নাব্য' এবং বঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলকে বলা হতো 'উপবঙ্গ' ও 'অনুত্তর'। বঙ্গের প্রায় সব অঞ্চল ছিল সমতলভূমি; যার বেশিরভাগই গঠিত হয়েছে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বয়ে নিয়ে আসা পলিমাটি দ্বারা। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার নদ-নদী অনেকবার তার গতিপথ বদলেছে; যার কারণে অনেক সমৃদ্ধ নগরী হারিয়েছে আবার অনেক নগরী নতুন করে জন্ম নিয়েছে, বঙ্গের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক এই জনপদগুলো একত্রিত করে পুর্ণাঙ্গ রাজ্য গঠন করার চেষ্টা করেন। তার মৃত্যুর পর বাংলা গৌড়, পুণ্ড্র ও বঙ্গ এই তিন রাজ্যে বিভক্ত

গৌড়, বঙ্গ ও বাঙ্গাল -এর ইতিহাস

ছিল। পাঠান শাসনামলের পূর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গ 'গৌড়' এবং পূর্ববঙ্গ 'বঙ্গ' নামে চিহ্নিত করা হয় এবং ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে মোঘল শাসন আমলে এই গৌড় ও বঙ্গকে একত্রে 'বাঙ্গাল' নামে ডাকা হয়।[২৭]

বঙ্গ থেকে 'বাঙ্গাল' নামের রুপান্তার নিয়ে ঐতিহাসিকরা বহুমত পোষণ করেছেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের রচয়িতা আবুল ফজলের মতে প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা বন্যা থেকে ফসলি জমি ও বসতবাড়ি রক্ষা করার জন্য ১০ গজ উচু এবং ২০ গজ লম্বা আল বা বাঁধ নির্মান করেছিলেন। বঙ্গে এতো বড় একটি আল অর্থৎ বাঁধ থাকার কারণে এই এলাকাটির নাম ছিল বাঙ্গাল। আবার প্রচীনকালে এদেশের আমির শ্রেণির লোকেরা পাহাড়ের পাদদেশে দশ হাত উঁচু এবং কুঁড়ি হাত চওড়া মাচা তৈরি করে তার উপর ঘর বানাতো। এই ঘরগুলো বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল এবং এই নাম অনুসারেই বঙ্গদেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা। অনেক ইতিহাসবিদ তাদের মতো করে বাঙ্গালা নামকরণের সম্ভব্য কারণ বর্ণনা করেছে; তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয় বঙ্গের সাথে সেমেটিক ভাষায় 'আল' শব্দের যুক্তকে। সেমেটিক ভাষায় 'আল' শব্দের অর্থ আওলাদ, সন্তান বা বংশধর এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙ্গাল শব্দটির অর্থ বঙ্গের বংশধর।[২৮]

নবী নূহের (আ) পৌপুত্র বঙ্গ অথবা মহাভারতের সুদেষ্ণনার পুত্র বঙ্গ এই দু'জনের মধ্যে যারই নাম অনুসারে এই বঙ্গ এলাকার নাম হোক না কেন। বাঙ্গাল মানে যে এই দুই জনের যে কোন একজনের বংশধরদের বোঝায় তা সহজেই অনুমেয়।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামের এই বৃহত্তর জনপদগুলো ছিল ভারতবর্ষের মূল ভূখন্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জৈন ধর্মসুত্রে জানা যায় জৈন প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেব বর্তমান অযোধ্যার বিনীত নগরে নিজ রাজ্য স্থাপন করে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করেন। তিনি তাঁর প্রজাদের কৃষি, ব্যবসা, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি ৭২ ধরণের বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করেন। এছাড়া রন্ধনশিল্প, সূচশিল্পসহ ৬৪ ধরণের শিল্প মানুষদের শিক্ষা দেন। তিনিই প্রথম আর্যাবর্তে আপন ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহপ্রথা বাতিল করেন। তাঁর কন্যা ব্রাহ্মীকে তিনি ১৮ রকমের লিপিবিদ্যা শিক্ষা দেন, তাই ভারতবর্ষের প্রাচীন লিপির নাম 'ব্রাহ্মী লিপি' হয়েছে ব্রাহ্মীর নাম অনুসারে। ঋষভদেবের প্রথম স্ত্রী সুমঙ্গলার গর্ভে জন্ম নেন সূর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'ভরত' এবং দ্বিতীয় স্ত্রী সুনন্দার গর্ভে জন্ম নেয় চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'বাহুবলি'। তীর্থংকর ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে ভরতের নাম অনুসারে নামকরণ হয়েছে ভারতবর্ষের। তিনি তাঁর জয়কৃত রাজ্য সমূহের নাম নিজ নাম অনুসারেই ভারত রাখেন।[২৯]

ভারত শব্দের উৎপত্তি ইতিহাস ও বাহুবলি প্রসঙ্গ

আর্যরা আসার আগে যারা বাংলায় বসবাস করত।

ভারতবর্ষের নিম্নভূমি সমুদ্রবর্তী বর্তমান বাংলার প্রাচীন অধিবাসী কারা এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের নানা ধরনের অভিমত রয়েছে; তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ একমত আর্যরা আসার আগে এখানে আরো চারটি জাতিগোষ্ঠী বসবাস করতো। এরা হলো নেগ্রিট, অস্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়।[৩০]

নেগ্রিট সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। দেখতে কৃষ্ণবর্ণ এবং পেশীবহুল গঠনযুক্ত শরীরের যে আদিম জাতি বঙ্গে বাসবাস করেছিল বলে ধারণা করা হয়, তাদের বলা হয় নেগ্রিট।

প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক জাতি বঙ্গে এসে নেগ্রিটদের উচ্ছেদ করে। প্রাচীন সাহিত্যে এদের নিষাদ জাতি বলা হয়েছে। এরা ছিল কৃষিনির্ভর জাতি; ধারণা করা হয় তারাই প্রথম আখের রস থেকে চিনি উৎপাদন করতো। বর্তমান বাংলাদেশে বসবাসকারী কোল, ভীম, সাঁওতাল, মুন্ডা নামের আদিবাসী নৃগোষ্ঠী অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিকদের বংশধর।

- দ্রাবিড়দের ইতিহাস

অস্ট্রো-এশিয়াটিকরা এদেশে আসার অল্প কিছুদিন পর দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে। দাজলা ও ফোরাত নদীর উপকূলে বসবাসকারী দ্রাবিড় জাতির একাংশ পশ্চিম এশিয়া থেকে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয় হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। তারা গঙ্গার মোহনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে এবং একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে। সে সময় বঙ্গের রাজা মাগদাধি ভারতের পূর্বসীমান্ত থেকে পাঞ্জাবের বিপাশা নদীতীর পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য নির্মাণ করেন। মিশর ও ব্যবিলনের সাথে এদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং দক্ষিণ ভারতীয় সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করে তারা ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য করতো। এরা অস্ট্রো-এশিয়াটিকদের তুলনায় উন্নত হওয়ায় তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। দ্রাবিড়রা ছিল সেমেটিক সভ্যতার উৎস সামের পৌপুত্র অর্থাৎ নূহের (আ) সপ্তম অধস্তন বংশধর আবু ফীরের সন্তান সন্তানাদি এবং একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারি।

এর অনেকপর ভোটচীনীয় বা মোঙ্গলীয় জাতি গোষ্ঠি এ দেশে আসে। এরা নূহের (আ) ছেলে ইয়াফিসের বংশধর এবং সময়ের বিবর্তণে তারা তুর্কি-মোঙ্গোলীয় জাতিতে পরিণত হয়। বাংলার উত্তর ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা নামের আদিবাসী নৃগোষ্ঠী এদের বংশধর।

গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা -এগুলো, ভোটচীনীয় বা মঙ্গলীয় বংশধর -

আর্যরা কয়েক শত বছর ধরে তাদের ছোটা ছোট দল নিয়ে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষ সময়ে তারা বর্তমান পাকিস্থানের পাঞ্জাব থেকে ভারতের বেনারস পর্যন্ত ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলে। তাদের আদি নিবাস ইরান ত্যাগের অন্যতম কারণ ছিল ধর্ম নিয়ে মতোবিরোধ এবং অভ্যান্তরিন যুদ্ধ-বিগ্রহ। সে সময়ে ইরানে যরথুষ্ট্র তাঁর এক ঈশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করেন। ইরানের রাজা গশতাসপ এবং কয়েক জন প্রভাবশালী ব্যক্তি যরথুষ্ট্র প্রচারিত নতুন ধর্মমত গ্রহণ করলে পুরোহিতরা জনগণকে উস্কিয়ে দেয়, এতে সারা দেশে বিদ্রোহ শুরু হয়। প্রকৃতি পূজারি আর্যরা এই বিদ্রোহে মূল ভূমিকা পালন করে। অভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলার সুযোগে তুরানীরা ইরানে একের পর এক অভিযান শুরু করে। যার কারণে ইরান থেকে সবার আগে সটকে পরে আর্যরা এবং ইরানের আদিবাসীরা দেশের বাহিরে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে।

আর্যরা ভারতে প্রবেশের পর থেকেই প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে থাকে দ্রাবিড়দের হটিয়ে তাদের নিজেদের স্থান স্থায়ী করার করার জন্য; কিন্তু তারা সহজে এতে সফল হয়নি। আর্যদের ক্রমাগত অভিযান দ্রাবিড়রা সফল ও কঠোর ভাবেই প্রতিরোধ করতে থাকে। যার কারণে বিন্ধ্যা পর্বত থেকে গঙ্গেয় ব-দ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চল দখলে নিতে আর্যদের কয়েক শত বছর সময় লাগে; কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী আর্যদের কাছে একসময় দ্রাবিড়রা পরাজিত হয়। দ্রাবিড়দের রাজ্যগুলো দখলে নেয় আর্যরা।[৩১] আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ পর্যন্ত এক হাজার বছরে আর্যরা উত্তর পশ্চিম ভারতে গান্ধার, কুরু, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ ও পাঞ্চাল নামে পাঁচটি বৃহৎ রাজ্য গড়ে তোলে।

গান্ধার রাজ্যের অবস্থান ছিল প্রাচীন ভারতের সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধু নদের দুই তীরে। সিন্ধু নদের তীর হতে বর্তমান আফগানিস্থানের অধিকাংশ এলাকা প্রাচীনকালে গান্ধার রাজ্যে নামে উল্লেখ ছিল। আফগানিস্থানের কান্ধাহার ছিল প্রাচীন গান্ধার নগরী। ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী ছিলেন গান্ধার শহরের রাজা সুবলের কন্যা এবং তার নাম অনুসারেই এই রাজ্যের নাম হয় গান্ধার। গান্ধারের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা এবং এর অবস্থান ছিল বর্তমান পাকিস্থানের রাওয়ালপিন্ডিতে।

দিল্লির উত্তরে বর্তমান হরিয়ানা প্রদেশে কুরুরাজ্যের অবস্থান ছিল এবং এর প্রাচীন নাম ছিল সমন্তপঞ্চক, চন্দ্রবংশীয় রাজা কুরু নিজ নাম অনুসারে এই রাজ্যের নাম রাখেন কুরুরাজ্য। মহাভারতের ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ এখানেই হয়েছিল।

হস্তিনাপুর ছিল মেরুট ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রাচীন রাজ্য এবং এর অবস্থান ছিল দিল্লীর পূর্বে গঙ্গা নদীর তীরে। মৎসপুরাণে উল্লেখিত ভরত বংশীয় রাজা হস্তী নিজ রাজধানী নির্মাণ করে নাম রাখেন হস্তিনাপুর। পঞ্চপাণ্ডব পরবর্তীতে হস্তিনাপুরে রাজত্ব করেন। — দিল্লির প্রাচীন নাম

দিল্লির প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। পঞ্চপাণ্ডব খ্যাত পাঁচ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থ শহরটি নির্মাণ করেন। রাজা দ্রুপদের কন্যা দ্রুপদীকে বিয়ে করে হস্তিনাপুরে আনলে ধৃতরাষ্ট্র তার রাজ্যের অধিকাংশ পঞ্চপাণ্ডবদের জন্য ছেড়ে দেন, যা খান্ডবপ্রস্থ নামে পরিচিত ছিল। পঞ্চপান্ডব এরাজ্যের প্রাচীন খান্ডববন ধ্বংস করে এই নগর নির্মাণ করেছিলেন।

পাঞ্চাল রাজ্যের অবস্থান ছিল দিল্লি থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত। রাজা দ্রুপদের রাজধানী ছিল এটি। পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রুপদী ছিলেন পাঞ্চাল দেশের রাজকন্যা; যার কারণে তার আরেকটি নাম ছিল পাঞ্চালী। প্রাচীন পাঞ্চাল রাজ্য বর্তমান রহিলাখন্ড এবং ফারাক্কাবাদের অন্তর্ভূক্ত।[৩২]

হস্তিনাপুরের সিংহাসন নিয়ে পান্ডবপুত্র এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে ১৮ দিন ব্যাপী মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধ কুরু রাজ্যের কুরুক্ষেত্র নামকস্থানে হওয়ায় এই যুদ্ধের নামও হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পান্ডব পক্ষে ছিলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং বিষ্ণুর প্রধান অবতার শ্রীকৃষ্ণ। ধৃতরাষ্ট্রে পক্ষে ছিলেন পান্ডবপুত্রদের বৈপিত্রীয় ভ্রাতা কর্ণ, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, দুঃশাসন সহ আরো বীরযোদ্ধা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পান্ডব পুত্ররা জয়ী হন এবং এই যুদ্ধের ফলে আর্যাবর্তে আর্যদের প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।[৩৩]

বৈদিক যুগ পরবর্তী ভারতবর্ষ সময়ের ধারাবাহিকতায় মগধ, মৌর্য, চোল, গুপ্ত, পাল সাম্রাজ্য ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে আরো বেশকিছু সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই সাম্রাজ্যগুলোর কর্ণধারদের বিষয়ে সারাংশ লিখতে গেলেও দীর্ঘ রচনার প্রয়োজন; তবে দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কথা না উল্লেখ করলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তারা হলেন রাজা শশাঙ্ক এবং লক্ষন সেন।

নরেন্দ্র গুপ্ত বা শশাঙ্ক ছিলেন বাঙ্গালী রাজাদের মধ্যে প্রথম সর্বভৌম নরপতি এবং মগধ ও গৌড়ের অধিপতি। তিনি ইতিহাসে বিজয়ী রাজার চেয়ে বৌদ্ধ বিদ্বেষী

শশাঙ্ক রাজা বা নরেন্দ্র গুপ্ত — বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিল

লক্ষণ সেন - এর মা এর ডেলিভারী -
দুঃখজনক কাহিনি

রাজা হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি গয়ার বোদ্ধিবৃক্ষ কেটে ফেলেন এবং নিকটবর্তী মন্দির থেকে বুদ্ধমুর্তি সরিয়ে ফেলেন। যার কারণে তার সারা শরীরে ক্ষত হয়ে মাংস পঁচে যায় এবং এর কিছু দিনপর তিনি মারা যান।[৩৪]

আনুমানিক ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তার রাজ্য সমূহে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং স্থানীয় ভূপতিরা নিজেদের স্বাধীন শাসক ঘোষনা করে। বড় মাছ ছোট মাছকে যেমন গিলে ফেলে ঠিক একই অবস্থা হয় ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলগুলোতে; যার কারণে শতবর্ষব্যাপী এই সময়কে ইতিহাসে বলা হয়েছে 'মাৎস্যান্যায়।'[৩৫]

আরবে সবচেয়ে অযাচার, আত্মকলহ এবং বিশৃঙ্খলা পূর্ণ সময়কে বলা হতো 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা অন্ধকার যুগ; সে সময় ইসলামের বাণী নিয়ে হজরত মোহাম্মদের (স) আত্মপ্রকাশ হয় এবং তিনিই আরবের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটান। আরবের 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' যখন শেষ, ভারতবর্ষের এ অংশে তখন শুরু হয় 'মাৎস্যান্যায়'; ঠিক ঐ সময়ই আরব থেকে হজরত মোহাম্মদের (স) সাহাবীরা এখানে আসেন ইসলামের বাণী নিয়ে। ভারতবর্ষে অরাজনৈতিক কিন্তু ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার হয় সেই সময়েই।

রাজা লক্ষণসেন বা রয় লখমনিয়ার জন্মের সময় রাজ জ্যোতিষরা তার মাতাকে বলেন, "যদি এই সময় আপনার সন্তান হয়, তাহলে সে কোন দিন রাজা হতে পারবে না, আর যদি দুঘন্টা পর হয় তাহলে আশি বছর বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করবে।" লক্ষণসেনের মাতা নির্দেশ দেন তার পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখার জন্য, যেন সন্তান ভূমিষ্ট না হয়। দুঘন্টা পর পা নামিয়ে আনলে লক্ষণসেনের জন্ম হয়; কিন্তু তার মাতা মারা যান। রাজা লক্ষনসেন যখন অতিবৃদ্ধ তখন তার রাজ জ্যোতিষরা তাকে বলেন, "শাস্ত্র মতে তুর্কিরা এ দেশ জয় করবে এবং সময় সন্নিকটে, তাই আপনার পালানোই শ্রেয়।" লক্ষনসেন জানতে চাইলেন, "তুর্কি বিজয়ীর চেহারা দেখতে কেমন শাস্ত্রে কি উল্লেখ আছে?" গুপ্তচর পাঠিয়ে এই তুর্কি সেনাপতির চেহারার বিবরণ আনা হয়, যা শাস্ত্রের সাথে মিলে যায়।[৩৬] তবে আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাজ জ্যোতিষরা লক্ষনসেনকে বলেছিলেন, "শিঘ্রই, আপনার রাজ্যের পতন হবে এবং আপনার ধর্ম চালু থাকবে না"। কিন্তু লক্ষনসেন তাদের কথা বিশ্বাস করেননি, তবে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা গোপনে রাজ্যত্যাগ করেছিলেন।[৩৭] রাজ জ্যোতিষদের সতর্কবাণী যেভাবেই বর্ণিত হোক না কেন তা শতভাগ সত্য হয়েছিল ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে, লক্ষনসেনের বয়স যখন আশি বছর। তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ঘোড়া বিক্রেতার

লক্ষনসেন এর পলায়নের বিবরণ

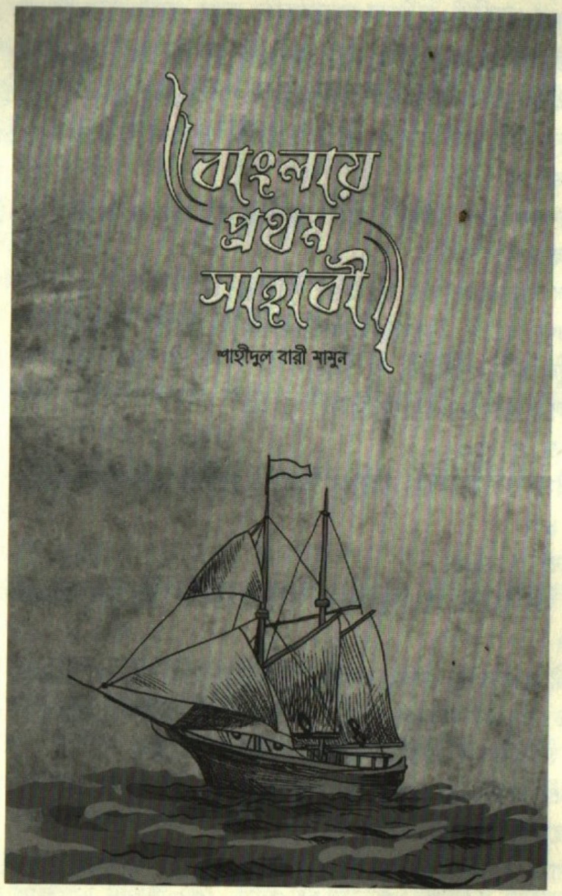
ছদ্দবেশে মাত্র আঠারো জন সৈন্য নিয়ে লক্ষনসেনের প্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং প্রাসাদে প্রবেশের পর হঠাৎ হামলা চালালে লক্ষনসেন আতঙ্কিত হয়ে দুপরের খাবার রেখেই প্রাসাদের গোপন পথে পালিয়ে যান।[৩৮] সেই দিন থেকেই বাংলায় রাজনৈতিকভাবে ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ হয়।

প্রাচীন আরবের ইতিহাস সমৃদ্ধ এবং রুপবদলকারী, তেমনি ভারতবর্ষে রাজনীতির অর্থাৎ রাজা, রাজ্য, নীতি ও নেতৃত্বের ইতিহাসেও এতো বেশি উথান-পতন এবং পরিবর্তন হয়েছে যা বিশ্বসভ্যতার আর কোন স্থানের ক্ষেত্রে এমনটা পাওয়া যায় না। শুধু রাজনীতিতেই নয় ভারতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রেও এরূপ বৈচিত্র বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। হিন্দু ধর্মের উদ্ভব এবং ব্যাপক প্রসার, জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব, সহবস্থান এবং প্রসার এছাড়া আরব থেকে ইসলামর ধর্মের আগমন ও প্রসার ভারতবর্ষে ধর্মের ইতিহাসকে আর যে কোন দেশের তুলনায় করেছে সমৃদ্ধ। আর এই ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সর্বপ্রথম ভূমিকা রেখেছে আরব থেকে আসা দেশত্যাগী ধর্ম প্রচারক সাহাবী এবং নৌপথে বাণিজ্য করতে আসা মুসলিম বণিক।

তথ্যসূত্র-

(১) (ক) ড. শাওকি আবু খলিল, আল কোরআনের মানচিত্র, সিরিয়া, ২০০১, পৃ. ১৭
(খ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা, ১৯৮৬, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪২
(গ) আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাসির আদ দামেশকী (র), আল বিদা ওয়ান নিহায়া, ইরাক, ৭৫১ হিজরি, ১ম খন্ড, পৃ. ২১৩
(২) পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪
(৩) পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২
(৪) পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭
(৫) আল কোরআন, সূরা মায়েদা ৫, আয়াত ২৭
(৬) (ক) ড. শাওকি আবু খলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
(খ) ইবনে কাসির আদ দামেশকী (র), পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২১৯
(৭) আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাসির আদ দামেশকী (র), তাফসিরে ইবনে কাসির, ইরাক, ১৭শ খন্ড, পৃ. ৬৮০
(৮) ইবনে কাসির আদ দামেশকী (র), আল বিদা ওয়ান নিহায়া, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩০
(৯) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩
(১০) মওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল রেহান, মুসলিম উম্মার ইতিহাস, করাচি, ১৯৯০, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৯
(১১) আল কোরআন, সূরা হুদ ১১, আয়াত ৪০
(১২) ড. শাওকি আবু খলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
(১৩) শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, মৎসপুরাণম, অনুবাদ- শ্রীযুক্ত পঞ্চকানন তর্করত্ন, কোলকাতা, ১৩১৬ সন, পৃ. ২-১৪ (সারাংশ)
(১৪) ইবনে কাসির আদ দামেশকী (র), পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৭১
(১৫) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭
(১৬) সৈয়দ সুলেমান নাদভী (র), আল কুরআনের ভৌগলিক ইতিহাস, লখনৌ, ১৯১৯, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫১
(১৭) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪
(১৮) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫
(১৯) (ক) গোলাম হোসায়ন সলীম, রিয়াজ-উস-সালাতীন, মালদহ, ১৭৮৮, পৃ. ১৬
(খ) গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৬৯

(গ) আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ১৯৮০, পৃ. ২৪
(২০) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, মহাভারত, অনুবাদ- রাজশেখর বসু, ২০১৬, পৃ. ৫৮ (হুবহু উপস্থাপন করা হয়েছে)
(২১) সুনীতিভূষণ কানুনগো, বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ১৯৯৪, পৃ. ৪৪
(২২) ড. মুহম্মদ আবদুল করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৭৭, পৃ. ২৫
(২৩) আবদুল গনী, প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক ভূগোল, ২০২১, পৃ. ১৪৯
(২৪) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮
(২৫) ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২০১৭, পৃ. ৬৩
(২৬) প্রত্যক্ষ দর্শণে বর্ণিত
(২৭) আব্দুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
(২৮) গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯
(২৯) আবদুল গনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭
(৩০) আব্দুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
(৩১) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
(৩২) ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রওশন আলী, প্রাচীন বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম, ২০০৯, পৃ. ৮৭
(৩৩) পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২
(৩৪) (ক) শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, কোলকাতা, ১৩৫২ সন, পৃ. ২৭
(খ) শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন, বাঙলার ইতিহাস, কোলকাতা, ১৯৪৯, পৃ.১২৫
(গ) ড. মুহম্মদ আবদুল করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৭৭, পৃ. ৬২
(৩৫) (ক) ড. মুহম্মদ আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
(খ) শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
(৩৬) শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮
(৩৭) গোলাম হোসায়ন সলীম, রিয়াজ উস সালাতীন, মালদহ, ১৭৮৮, পৃ. ৪৪
(৩৮) তাবকাত-ই-নাসিরী, মীনহাজ-ই-সিরাজ, দিল্লি, ১২০৬, পৃ. ৩০



আরব বণিকদের বাণিজ্যযাত্রা এবং সমৃদ্ধ বাংলায় তাদের আগমন

আরবের অধিকাংশ স্থান অনুর্বর মরুভূমি এবং আবহাওয়া অত্যন্ত রুক্ষ হওয়ায় প্রাচীন আরবে কৃষি কাজের প্রচলন ছিল খুব কম। জীবিকার জন্য আরবদের নির্ভর করতে হতো ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর এবং তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণের অধিকাংশই ছিল আমদানি নির্ভর। ভৌগলিক কারণে জল ও স্থল উভয় পথেই তাদের খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করতে হতো; যার কারণে অনেক আগে থেকেই আরবরা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। হজরত ইউসুফকে (আ) যে কাফেলা মিশরে নিয়ে গিয়েছিল সে কাফেলায় আরব বণিকও উপস্থিত ছিল। আরবদের বাণিজ্যের ইতিহাস কতোটা পুরনো এই ঘটনা থেকেই তা ধারণা পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাল থেকেই আরবরা বাণিজ্যের প্রয়োজনে স্থল ও জলপথে দুরদূরান্তের দেশে যেতো। মরুভূমি অত্যন্ত উষ্ণ হওয়ায় আরবরা মরুভূমিতে রাতে পথ চলতো এবং দিনে বিশ্রাম নিতো। মরুতে চলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হল 'ইলমুল রিয়াফাহ' বা 'পানি অনুসন্ধান বিদ্যা' সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা রাখা। মাটি বা উদ্ভিদের গন্ধ শুঁকে, বিশেষ কোন প্রানীর পায়ের ছাপ দেখে অথবা মাটিতে কান লাগিয়ে পানির উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার এই বিদ্যা আরবরা খুব ভালভাবেই রপ্ত করেছিল।[১]

মরুযাত্রার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা হল 'ইলমুল ইয়াফাহ' বা 'পদচিহ্ন অনুসন্ধান বিদ্যা'। শুধুমাত্র পায়ের ছাপ দেখেই কোন ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা সনাক্ত করতে এমনকি অসংখ্য পায়ের ছাপের মাঝে নিজের পালিত ঘোড়া, উট বা গাধার পায়ের ছাপ নির্ভুলভাবে চিনতে পারা যেত এই বিদ্যার মাধ্যমে। মরুবাসী আবরবা এই বিদ্যায় খুব পারদর্শি ছিল।[২]

মরুতে বা সাগরে রাতে পথ চলতে তাদের পথপ্রদর্শক ছিল আকাশের নক্ষত্র। ইসলাম প্রচারের বহু আগে থেকে আরবরা নক্ষত্র দেখে পথ চলতো এবং তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নক্ষত্রের নামকরণ করেছিল, যেমন- সুহাইল (অগস্ত্য, শরৎকালের শুরুতে দক্ষিণ আকাশে একটি উজ্জল নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয়রা অগস্ত্য মুনির নাম অনুসারে এর নাম দিয়েছিল অগস্ত্য নক্ষত্র), সুহাইল যামানী (ইয়েমেনের অগস্ত্য), শুরা শামিয়াহ (সিরিয়ার বড় কুকুর), কুতুবাইন (ধ্রুব তারা), শুরা (বড় কুকুর), বানাতুন নাআশ (সপ্তর্ষী মন্ডল), ফারকাদীন (লঘু সপ্তর্ষি) ও সুরাইয়া (কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ)। আরবরা এই নামগুলো দিয়ে সময় ও দিনক্ষণ ঠিক করতো এবং কবিতায় ব্যবহার করতো।[৩]

আরবরা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল

খ্রিষ্টপূর্ব দুহাজার অব্দে ইব্রাহিমের (আ) সময়েও আরবদের মাঝে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা ছিল তার প্রমান আল কোরানে পাওয়া যায়- "তারপর ইব্রাহিম নক্ষত্ররাজির দিকে তাকাল। বলল, আমি (তোমাদের উপাস্যদের নিয়ে মর্ম) পীড়ায় ভুগছি। সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন তাকে একা রেখে চলে গেল।"[৪] ইব্রাহিমকে (আ) যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন অগ্নিউপাসনরি মেলায় যওয়ার জন্য তাঁকে বলেছিল তখন তিনি না যাওয়ার অযুহাত হিসেবে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "আমি অসুস্থ"। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করেছিল কোন নক্ষত্রের প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়েছেন।[৫]

আরবরা তাদের প্রয়োজনের তাগিদে জ্যোতির্বিদ্যায় এতোটা পারদর্শী ছিল যে নক্ষত্র সম্পর্কে বলতে পারা তাঁদের একটি স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। একদা এক আরব বেদুইন শহরের একজনকে বৃষ্টির পূর্বাভাসদাতা নক্ষত্র, পথপ্রদর্শক নক্ষত্র, রাত্রিপ্রহর নির্ধারিনী নক্ষত্র এবং শুভ-অশুভ নির্ধারনী নক্ষত্র সম্পর্কে বলছিল। সেখানে উপস্থিত আরেকজন শহরের লোক এক বৃদ্ধলোককে বললেন, "নক্ষত্র সম্পর্কে এরা আমাদের চেয়ে ভাল জানে।" উত্তরে বৃদ্ধলোক বললেন, "তাই-তো হওয়ার কথা, নিজের ঘরের কড়িকাঠ কে'না চেনে।" অর্থাৎ আরবদের কাছে নক্ষত্র ছিল তাঁদের ঘরের কড়িকাঠের মতো।

প্রাচীনকালে ভারতীয়রা চাঁদের কক্ষপথকে ২৭ ভাগে ভাগ করেছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল পূজা-আর্চণার সময়, তীর্থযাত্রা এবং বিভিন্ন শুভকাজের দিন-ক্ষন নির্ধারণ। অপরদিকে আরবরা করেছিল ২৮ ভাগে বিভক্ত, তাদের উদ্দেশ্য বৃষ্টিপাত ও মৌসুমি বায়ুর গতি প্রকৃতি অর্থাৎ আবহাওয়া সংক্রান্ত ধারণা করা। বাণিজ্যযাত্রার ক্ষেত্রে তাঁরা এগুলো বিশেষভাবে অনুসরণ করতো।[৬] নৌযাত্রার ক্ষেত্রে মৌসুমি বায়ুর গতি প্রকৃতি অনুসরনের গুরুত্ব আরব বণিকরা সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন। যার কারণে নৌযাত্রার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক আবহাওয়া পাওয়া যায় এমন মাসকে তাঁরা যাত্রার জন্য বেছে নিতো। আরব বণিকরা নৌযাত্রার এই সুবিধাজনক সময়কে বলতো 'মৌজিম' যার অর্থ বাণিজ্যের ঋতু। এই 'মৌজিম' শব্দটি পরবর্তীতে ভারতে এসে হয় 'মৌসুম' এবং ইউরোপে গিয়ে হয় 'মনসুন'।[৭]

নক্ষত্রের নামকরণ ছাড়াও আরব বণিকরা তাদের বাণিজ্যযাত্রার সুবিধার্থে কুতুবনুমা নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশক যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। তারা কুতুবনুমায় মাছের আকৃতির ভেতরে ফাঁপা একটি লোহার দণ্ডকে চুম্বকের সাথে

মৌসুম, মৌজিম, মনসুন এর ইতিহাস

কম্পাস এর কুতুবনুমা আরবরা তৈরি করে প্রথম

ঘষে অথবা এর মুখে চুম্বক লাগিয়ে পানিতে ভাসমান কোনকিছুর সাথে যুক্ত করতো। কাঠের বাক্সে পানি রেখে তার উপর এই মাছটি রাখলে মাথা ও লেজ উত্তর-দক্ষিণ হয়ে থাকতো। এই কুতুবনুমা আরব বণিকরাই সর্বপ্রথম ইউরোপে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে ইউরোপিয়ানরা আরবদের তৈরি এই কুতুবনুমাকে আরও উন্নত রূপদান করে কম্পাস নামকরণ করে।[৮]

দূরদেশে বাণিজ্য আরবদের কাছে শুধুমাত্র জীবিকার উৎস ছিল তা কিন্তু নয়। তাঁদের কাছে আভিজাত্য এবং সমৃদ্ধির ধারক এবং পরিমাপক ছিল বাণিজ্যযাত্রা। মক্কার সবচেয়ে অভিজাত কোরাইশ বংশের আভিজাত্যের প্রতীক ছিল বাণিজ্যযাত্রা। তাঁরা শীত ও গ্রীষ্মে বছরে দুবার বাণিজ্যযাত্রায় বের হতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআনে বলেন,"অতএব কোরাইশদের নিরাপত্তার জন্য, শীত-গ্রীষ্মের বাণিজ্যযাত্রায় নিরাপদ থাকার জন্য তাদের উচিত কাবাঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা।"[৯]

মৌসুমি বায়ুর কারণে তারা শীতকালে বাণিজ্যে যেতো ইয়েমেনের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে যেতো সিরিয়ার দিকে এবং তাদের বিভিন্ন জনের বাণিজ্যের স্থান ছিল বিভিন্ন দেশে। বনু আবদে মানাফের চার ভাইয়ের মধ্যে হাশেম বাণিজ্য করতো সিরিয়ায়, আবদে শামস আবিসিনিয়ায়, আল-মুত্তালিব ইয়েমেন এবং নওফেল বাণিজ্য করতো পারস্যে।[১০] সেই সময় আরবের বাণিজ্য কাফেলায় থাকতো অন্তত হাজার খানেক উট ও ঘোড়া। কোন কোন কাফেলায় এক থেকে আড়াই হাজার পর্যন্ত উট থাকতো। পথপ্রদর্শক অশ্বারোহী দলের পেছনে থাকতো মূল কাফেলা এবং নিরাপত্তার জন্য থাকতো অস্ত্রসজ্জিত প্রহরী। আরবদের বাণিজ্য কাফেলায় হামলা বা ডাকাতি করা চেষ্টা আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছিল একই কথা। ২ হিজরি বদর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলায় হামলা করা নিয়ে।

আরবের পূর্বে পারস্য ও ওমান উপসাগর, দক্ষিণে আরব উপসাগর ও ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর হওয়ায় স্থল পথের পাশাপাশি তাদের নৌপথেও বাণিজ্যযাত্রা করতে হতো। সমুদ্রতীরবর্তী আবিসিনিয়া অর্থাৎ বর্তমান ইরিত্রিয়াকে আরবরা তাদের দ্বিতীয় জন্মভূমি মনে করতো। মক্কার জেদ্দা বন্দর থেকে অবিসিনিয়ার মেসেওয়া বন্দরে নৌপথে যাতায়াত করা ছিল তাদের কাছে খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। অনেক আগে থেকেই আরবরা ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে চীন পর্যন্ত যেতো। চীন ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপকরণ এনে পারস্য এবং

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করতো।

আরবদের নৌপথে বাণিজ্যযাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় প্রাক-ইসলামি যুগে তাদের লিখিত বিভিন্ন সাহিত্যে। জাহেলি যুগে বছরের সেরা সাতটি কবিতা নির্বাচিত করে কাবার দরজায় ঝুলিয়ে রাখার নিয়ম ছিল; একে বলা হতো সাব'য় মুয়াল্লকা বা ঝুলন্ত সপ্তক। কাবা শরিফ ঘিরে প্রতিবছর একটি মেলার আয়োজন করা হতো, যেখানে সারা বছর লিখিত কবিতাগুলোর মধ্যে সেরা সাতটি কবিতা নির্বাচন করে কাবার দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হতো।[১১] সেই সময়ের প্রখ্যাত কবি তা'রাফা ইবনে আবদ লিখিত ঝুলন্ত কবিতায় আরব এবং আশেপাশের দেশগুলোর নৌজাহাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন-"মালিক গোত্রের মেয়েদের ডুলিগুলো ভোরবেলা যাত্রার সময় মনে হয় যেন নওয়াসিফের বিশাল জাহাজ, যেন রোমানদের বিশাল জাহাজ অথবা ইবনে ইয়ামেনের জাহাজ; যেগুলো নাবিকরা কখনও নিয়ে যায় পথ থেকে বিপথে আবার কখনও সঠিক পথে।" তার এই কবিতায় উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাক-ইসলামি যুগে আরব, পারস্য ও রোমানদের নৌজাহাজের কথা। এছাড়া ইবনে ইয়ামেন নামের একজন ইহুদি আরব বণিক যিনি অনেক জাহাজের মালিক ছিলেন, তার জাহাজের কথাও উল্লেখ পাওয়া যায় কবি তা'রাফার কবিতায়। এছাড়া কবি তা'রাফার আরেকটি কবিতায় জাহাজের হালের সাথে তিনি তার উটনীর গ্রীবার সাথে তুলনা করে লিখছেন- "সে যখন দীর্ঘ বাঁকা ঘাড় তুলে উঠে দাঁড়ায় তখন মনে হয় যেন একটি জাহাজের হাল, পাল তুলে যায় উজানে দজলা দরিয়ায়।" এছাড়াও জাহেলি যুগের অন্যান্য প্রখ্যাত কবি ইমরুল কায়েস, আ'শা মায়মুন ও আমর ইবনে কুলসুমের কবিতাতেও সেকালের নৌবহরের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের কবিতা থেকেই বোঝা যায় প্রাচীন আরবে অনেক আগে থেকেই নিয়মিত নৌপথে লোকজন যাতায়াত করতো।[১২]

আরবদের নৌবাণিজ্যের ব্যাপকতা এবং নৌযুদ্ধের সূচনা লাভ করে ইসলাম প্রচারের শুরু থেকে। ইসলাম ধর্ম আরবদের জন্য শুধু একটি নতুন ধর্ম নয় শুদ্ধ চিন্তায় পরিপূর্ণ জীবনও দান করে। আরবরা অর্জন করে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মতাদর্শ। আর এই মতাদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখে তাদের নৌঅভিযান ও নৌবাণিজ্য।

রসুলের (স) সময় ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ আরবের মক্কা, মদিনা এবং ইয়েমেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। ১১ থেকে ১৩ হিজরিতে হজরত আবু

বকরের (রা) শাসনামলের মাত্র দুই বছরে তা ইরাক এবং সিরিয়াতে ছড়িয়ে পরে। হজরত ওমরের (রা) সময় অর্থাৎ ১৩ থেকে ২৩ হিজরিতে এই দশ বছরে মুসলিমদের রাজ্যসীমা পারস্য, পারস্য উপসাগরের উপকূল এলাকা, একদিকে লিবিয়া, ফিলিস্তিন অপর দিকে মিশর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মিশরেই ছিল তখন বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি নৌবন্দর। এছাড়া পারস্য উপকূলের সবচেয়ে প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ বন্দর ছিল ওবুল্লা। এই তিন বন্দর থেকে অনেক আগে থেকেই বণিকরা বড় বড় পাল তোলা জাহাজে করে ভারতবর্ষ হয়ে চীনে গিয়েছিল। আবার ভারত ও চীনের বণিকরাও এখানে নিয়মিত আসতো তাদের পণ্য সামগ্রী নিয়ে। মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর থেকে এই বন্দরগুলোর ব্যবহার বহুগুণ বেড়ে যায়। সেই সাথে বেড়ে যায় আরবদের নৌঅভিযান ও নৌবাণিজ্য।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নাজিল হওয়া পবিত্র কুরআনে প্রায় ৫০টি আয়াতে বাণিজ্য, জীবিকার সন্ধানে সমুদ্রে গমন, সমুদ্রে জাহাজ চলাচল, সমুদ্র থেকে মাছ ও মুক্তো সংগ্রহ এবং সমুদ্র থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ সংগ্রহের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। ২৮টি আয়াতে শুধুমাত্র নৌযানের কথা বলা আছে; এছাড়া পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম নৌযান সম্পর্কে জানতে পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনে। মহাপ্লাবনের পূর্বে হজরত নুহকে (আ) আল্লাহ একটি কাঠের জাহাজ বানানোর নির্দেশনা দিয়ে বলেন- "তুমি আমার তত্ত্বাবধানে আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে একটি জাহাজ বানাতে শুরু করো।"[১৩]

অর্থাৎ পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম নৌযানটি নির্মাণ করা হয়েছিল সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে। এছাড়া পবিত্র কুরআনে কিছু আয়াত পাওয়া যায় যা নৌপথে বাণিজ্য এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদ অন্বেষণে উৎসাহিত করে।

"আল্লাহ সমুদ্রকে নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করতে পারে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধান করতে পারো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"[১৪]

"সমুদ্রের দুই বিশাল স্রোতধারাকে তিনি মুক্তভাবে প্রবাহিত করেন, যাতে তারা পরস্পর মিলিত হতে পারে। কিন্তু তাদের মাঝে রয়েছে অদৃশ্য দেয়াল, ফলে তারা পরস্পরকে অতিক্রম করতে পারে না। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? আর সমুদ্রে উৎপন্ন হয় মুক্তো ও প্রবাল। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সমুদ্রে চলমান পর্বতের মতো শোভমান নৌযানগুলো তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?"[১৫]

"সে কারণে দেখ, পানির দুটি ধারা একরকম নয়-একটি পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটি লবণাক্ত ও বিস্বাদ। দুটি থেকেই তোমরা তাজা মাছ খাও এবং অলংকারের জন্য রত্ন আহরণ করো। আর তোমরা দেখ, উভয়ের বুক চিরেই নৌযান চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সম্পদ অনুসন্ধান করতে পারো। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারো।"[১৬]

"তিনি সমুদ্রকে (তাঁর নিয়মের) অধীন করেছেন, যাতে তোমরা তাজা নরম মাংসল মাছ আহার করতে পারো আর আহরণ করতে পারো (মুক্তো, ঝিনুক, প্রবাল ও অন্যান্য) সামগ্রী, যা তোমাদের অলংকারকে মনোহর করে। আর সমুদ্রের বুক চিরে চলাচল করে জাহাজ, যার মাধ্যমে তোমরা স্রষ্টার অনুগ্রহ সম্পদ অনুসন্ধান করতে পারো আর তোমরা যেন শোকরগোজার হও।" [১৭]

"আল্লাহর মহিমার আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি সুখবর বহনকারী বায়ু প্রেরণ করেন, যেন তোমরা (প্রাণদায়ী বৃষ্টির মাধ্যমে) তাঁর অনুগ্রহ সম্পদ আস্বাদন করতে পারো। আবার এ বায়ুর সাহায্যেই তাঁর বিধান অনুসারে নৌযানগুলো বিচরণ করে, এভাবেও তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সম্পদ অন্বেষণ করতে পারো এবং তাঁর প্রতি শোকরগোজার হতে পারো।" [১৮]

পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আয়াতগুলো সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তাঁরা কোরআনের আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করে সমুদ্রে আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ অন্বেষণ অর্থাৎ জীবিকার জন্য সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ এবং তা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দেশে নৌযাত্রা করেন। বাণিজ্যের জন্য দীর্ঘ পথ যাত্রা করা আরবদের রক্তের সাথে অনেক আগে থেকেই মিশে ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র কুরআনে সৎ উপায়ে ব্যবসা, সমুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার ও সমুদ্র পথে যাতায়াতের কথা উল্লেখ থাকার কারণে নৌবাণিজ্য লাভ করে নতুন এক মাত্রা। হজরত মোহাম্মদের (স) ওফাতের পর খলিফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসী খিলাফত এবং ওসমানী খিলাফতের শাসকরা নৌবাণিজ্য এবং নৌঅভিযানে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাদের শাসনামলে মুসলিম সভ্যতার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং রাজনৈতিকভাবে রাজ্যসীমা বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার ছিল নৌবাণিজ্য এবং নৌঅভিযান। খিলাফতের শাসকরা সময়ের প্রয়োজনে এমন কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন যা তাদের সাম্রাজ্যের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

বাণিজ্যিক প্রয়োজনে নীলনদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করেন-

খলিফায় রাশেদিনের তৃতীয় খলিফা ওমরের (রা) শাসনামলে ১৮ হিজরি আরবে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তীব্র খরায় আরবে প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যশস্য উৎপাদন না হওয়ায় খলিফা ওমর (রা) মিশর থেকে খাদ্যশস্য আমদানির পরিকল্পনা করেন। কিন্তু স্থলপথে উটের পিঠে করে দীর্ঘ পথ পারি দিয়ে এতো খাদ্যশস্য মিশর থেকে মদিনায় আমদানি করা দীর্ঘ সময় এবং ব্যয় সাপেক্ষ; যার কারণে তিনি মাত্র ছয় মাসে নীলনদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত উনসত্তর মাইল দীর্ঘ খাল খনন করেন। সেই পথে প্রথম বছরেই মিশর থেকে বিশটি জাহাজ ষাট হাজার টন খাদ্যশস্য বোঝাই করে বর্তমান মদিনার ইয়াবনু বন্দরের কাছাকাছি প্রাচীন জার বন্দরে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে এসে পৌছে। এই খালটির কারণে আরব ও মিশরের নৌবাণিজ্য আরো বেশি প্রসার লাভ করেছিল এবং খালটি ১০০ হিজরি অর্থাৎ ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের (র) শাসনামল পর্যন্ত ব্যবহার করা হতো। পরবর্তী সময়ে সংস্কারের অভাবে খালটির বিভিন্ন স্থানে মাটি ভরাট হয়ে যায় এবং চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পরে। অবশেষে আব্বাসিয় খলিফা মনছুর রাজনৈতিক কারণে খালটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেন।

খলিফা ওমরের (রা) শাসনামলে মিশরের গভর্ণর আমর ইবনে আস (রা) সর্বপ্রথম সুয়েজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে ষাঁট মাইল খাল কেটে লোহিত সাগরের সাথে ভূমধ্যসাগরের সংযোগ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এই খাল খননের অনুকূলে না থাকায় খলিফা ওমর (রা) এই খাল খননের অনুমতি দেননি।[১৯] অর্থাৎ আধুনিক সুয়েজ খাল নির্মাণের পরিকল্পনা আজ থেকে বহু আগে আরবরাও করেছিলেন। শুধু ব্যবসার কারণেই নয় ধর্ম প্রচারের জন্য নৌযাত্রা হজরত মোহাম্মদ (স) বিশেষভাবে বরকতময় বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে হাদিসে পাওয়া যায়- উম্মে হারাম (রা) থেকে বর্ণিত, "আমি রসুলকে (স) বলতে শুনেছি আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম সামুদ্রিক অভিযানে অংশগ্রহণকারীর বাহিনীর জন্য জান্নাত অবধারিত।"[২০]

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত।"একদিন নবীজী (স) উম্মে হারামকে (রা) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক আল্লাহর পথে সাগর পারি দিয়ে যুদ্ধ করবে। উম্মে হারাম (রা) সেই নৌ সেনাদলে অংশ নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, তুমি প্রথম দলে থাকবে।"[২১]

ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফানের (রা) খিলাফতের সময় আমির মোয়াবিয়ার (রা) উদ্যোগে ২৮ হিজরিতে কারাবাছ অর্থাৎ বর্তমান

সাইপ্রাসে নৌ-অভিযান চালানো হয়। উম্মে হারাম (রা) তাঁর স্বামী উবাদা বিন সামিতের (রা) সাথে সেই নৌ-অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া এই নৌঅভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন আইয়ুব আল আনসারী (রা), আবু জার গিফারী (রা), সাদ্দাদ বিন আউস (রা) এবং উমারা বিন আসাদ (রা) সহ প্রথম সারির সম্মানিত বেশ কয়েকজন সাহাবী এবং সেই সময় প্রথম আরব নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আবদুল্লাহ বিন কায়েস হারিসী (রা)। প্রথম নৌঅভিযানেই সাইপ্রাস মুসলিমদের অধিগ্রহণে আসে। আবদুল্লাহ বিন কায়েস হারিসী (রা) ২৮ হিজরি থেকে শুরু করে রোমানদের বিরুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশটি নৌঅভিযান পরিচালনা করেন। সাইপ্রাস বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনি রোডস, আরওয়াদ, কোচ দ্বীপপুঞ্জ জয় করে ক্রেট ও ইতালির সিসিলি দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছান। এতে রোমানরা কোণঠাসা হয়ে পরে এবং একের পর এক তাদের উপকূল অঞ্চল হারাতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন খিলাফতের মুসলিম শাসকরা ক্রামগত নৌঅভিযান চালাতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে আরবদের ধর্মযুদ্ধে নৌঅভিযান ও নৌবাণিজ্যের পরিধিও বাড়তে থাকে এবং এর চূড়ান্ত রূপ লাভ করে উসমানী খিলাফতের সময়।

ইসলাম প্রচারের বহু আগে থেকে বাণিজ্য করার জন্য ভারত-চীন থেকে এশিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত একটি অলিখিত বাণিজ্য পথ ছিল একে বলা হতো রেশম পথ বা সিল্ক রোড। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এই রেশম পথ বা সিল্ক রোডের কারণে। রেশম পথ নির্দিষ্ট কোন একটি পথ ছিল না, ছিল একাধিক পথের গুচ্ছ। রেশম পথ চালু হওয়ার শুরুতে তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় পণ্য ছিল চীনের রেশম, যা ভূমধ্যসাগরে উপকূলীয় দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হতো। আর এজন্য এই পথটির নাম হয় রেশম পথ। ১৫০ খ্রিষ্টপূর্বে চীনের হান রাজা সর্বপ্রথম এই পথের প্রচলন করেন। তখন চীন এই পথে রেশমি কাপড় এবং পরবর্তী সময়ে কাঁচের জিনিসপত্র, চা, আফিম, কাগজ ও বারুদ রপ্তানী করতো। এই পথের অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করতো চীন বাকি অর্ধেক করতো রোমানরা; কিন্তু ইসলাম প্রচারের ত্রিশ বছরের মধ্যে ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়া অর্থাৎ রেশম পথের দুই তৃতীয়াংশই মুসলিমদের দখলে চলে আসে। তখন মুসলিমরা বিশেষত আরবরা এই পথটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করার সুযোগ পায়। রেশম পথের স্থল পথে আরব থেকে চীনে যাওয়া ছিল সময় সাপেক্ষ, কষ্টসাধ্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ; কারণ এই পথের মাঝে ছিল এশিয়ার সবচেয়ে বড় এবং ভয়ঙ্কর গোবি মরুভূমি। আরবরা ইরান পার হয়ে

পামুরে গোবি মরুভূমিতে প্রবেশ করতো, এরপর অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে চীনের মূলভূখন্ডে প্রবেশ করতে হতো। স্থলপথে চীনে যাওয়ার চেয়ে নৌপথে যাওয়া আরবদের কাছে বেশি সহজ ছিল। যার কারণে আরব বণিকরা নৌপথে লারওয়াই (আরব সাগর), হারগিন্দ (ভারত সাগর), কালাহ (বঙ্গোপসাগর) ও জিনজি (চীন সাগর) হয়ে চীনে পৌছাতো।

১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মোহাম্মাদ আল ফাতিহ কনস্টান্টিনোপল জয় করে ইউরোপকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে রাখতে রেশম পথের স্থল অংশে সকল ব্যবসায়িক লেনদেন সীমিত করে দেন। অপরদিকে রেশম পথের সমুদ্র বাণিজ্যে উচ্চ কর ধার্য করেন, যার করণে ইউরোপিয়ানদের আমদানিকৃত পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। এতোটাই বেড়েছিল যে মালাবার থেকে আনা এক পাউণ্ড জয়ফলের দাম হয়ে গিয়েছিল সাতটি মোটাতাজা ষাঁড়ের দামের সমান।[২২] কালক্রমে এই রেশম পথটি বন্ধ হয়ে যায়।

আরব বণিকরা রেশম পথের নৌপথ ব্যবহার করে মক্কার জেদ্দা বন্দর ও মদিনার জার বন্দর থেকে কাঠের তৈরি বড় বড় পালতোলা জাহাজে করে চীনের খানফুরা বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দিতো। সাথে নিতো আরবের ঘোড়া এবং দুম্বার চামড়া। চীনে পৌছতে তাদের বেশ কয়েকটি বন্দরে থামতে হতো; এ সময় তারা তাদের জাহাজগুলো মেরামত করতো, পরবর্তী সফরের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার ও বিশুদ্ধ পানীয় সংগ্রহ করতো এবং তাদের পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করতো। মূলত তারা এই বন্দরগুলোকে যাত্রা বিরতীর স্থল হিসেবে ব্যবহার করতো। এছাড়া আরব বণিকরা তাদের গন্তব্যের দূরত্বের হিসাব রাখার জন্য এই বন্দরগুলোর সংখ্যা হিসেবে রাখতো এবং এই বন্দর সংখ্যাকে বলতো বিশ্রাম, যেমন আরব থেকে চীন ছিল তের বিশ্রামের পথ অর্থাৎ আরব থেকে চীনে যেতে তেরটি বন্দর অতিক্রম এবং যাত্রা বিরতি করা প্রয়োজন হতো।

আরব বণিকদের জাহাজ যাত্রা শুরু করার পর প্রথম বিশ্রাম ছিল ইয়েমেনের এডেন বন্দরে। প্রচীন সমৃদ্ধ এই বন্দরে অনেক আগে থেকেই জেদ্দা, আবিসিনিয়া, দেবল, মালাবর, সাতই-উল-গঙ্গা, সালাহাত (বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও সিলেট) ও চীন থেকে বণিকরা এসে ব্যবসা করতো। শুধু তাই নয় খ্রিষ্টপূর্ব ১২৫ অব্দ থেকে ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ আরবে হিময়ার রাজবংশের শাসনামলে ইয়েমেনি বণিকরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে গিয়ে স্বর্ণ, দামি পাথর, চন্দনকাঠ, মসলা এবং আতর সংগ্রহ করতো। আরব ইতিহাসবিদ বাশশারী মুকাদ্দেসী এডেন বন্দরের

সম্পর্কে লিখেছেন, "কেউ যদি হাজার রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে এখানে আসে তাহলে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফিরে যান। একশো অবশ্যই পাঁচশো হয়ে যায়।"[২৩] এডেন বন্দর যে কতোটা সমৃদ্ধ ছিল তা বাশশারী মুকাদ্দেসীর এই কথাতেই ধারণা পাওয়া যায়।

এডেন বন্দর পার হয়ে আরব বণিকদের নৌবহর গিয়ে থামতো প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রথম বন্দরে। প্রাচীনকাল থেকেই শুধু আরব নয় ইউরোপের সাথেও ভারতবর্ষের ব্যবসায়িক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। গ্রীকবীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষের গঙ্গড়িডি আক্রমণ করার অনেক আগে থেকেই ইউরোপের সাথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তখন মিশর রোমের অধীনে থাকার কারণে রোমানরা মিশরের নৌবন্দর ব্যবহার করে ভারতবর্ষের সাথে বাণিজ্য করতো। আরব বণিকদের কাছে এই ভারতবর্ষের প্রথম বন্দর ছিল দেবল অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্থানের করাচী বন্দর। এই বন্দর থেকেই মুসলিমদের ভারতবর্ষে ধারাবাহিক বিজয় অভিযান শুরু হয়েছিল। হজরত ওমরের (রা) শাসনামল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অভিযান চলেছিলো এই বন্দরে। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের উমাইয়া খিলাফতের সময় মোহাম্মদ বিন কাসিম এই দেবল বন্দরে তার নৌবহর নোঙ্গর করান এবং রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু জয় করেন।[২৪]

দেবল বন্দরের পরে আরব বণিকদের লক্ষ্য ছিল মালাবার। ভারতবর্ষের সর্ব দক্ষিনে ম্যঙ্গালোর থেকে কুমারিকা প্রণালী পর্যন্ত আরব সাগর উপকূলীয় অঞ্চল ছিল মালাবার যা বর্তমানে কেরালা নামে পরিচিত। প্রাচীনকাল থেকেই মালাবার মসলার জন্য বিখ্যাত ছিল এবং এখানে উৎপাদিত গোলমরিচ ছিল অন্য যেকোনো স্থানের চেয়ে সেরা, এছাড়া মালাবারে এর সহজলভ্যতাও ছিল অনেক বেশি। যার কারণে মালাবার বাহিরের দেশের বণিকদের কাছে পরিচিত ছিল গোলমরিচের দেশ নামে। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করা আয়ুর্বেদ নামক চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবহারিত মসলা এবং ঔষুধী গাছপালার একটি বড় অংশ পাওয়া যেতো মালাবারে; আর এই ভারতবর্ষের মসলার কথা আরবরা অনেক আগে থেকেই জানতো।

তখন মালাবার কয়েকটি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল কালিকট রাজ্য। এই রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তিই শক্তিশালী হয়েছি মসলার ব্যবসার কারণে। এখানে প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ, লবঙ্গ এবং অন্যান্য মসলা উৎপাদিত হতো, এছাড়া আশে পাশে ছোট ছোট রাজ্য

এবং প্রশান্ত মহাসাগরে ছোট ছোট দ্বীপগুলোতে উৎপাদিত মসলা এখানেই চলে আসতো। বাহিরের দেশের বণিকরা বিশেষত আরব বণিকরা মালাবারের কালিকট রাজ্য থেকেই সব চেয়ে বেশি মসলা সংগ্রহ করতো এবং পরবর্তীতে তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করতো।

এখানে আসার সময় আরবরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘোড়া সাথে করে নিয়ে আসতো, কারণ তখন আরবদের প্রধান বিক্রয়যোগ্য পণ্য ছিল ঘোড়া। তাদের ঘোড়ার বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা প্রাচীন কালে ছিল এবং এখনও আছে, কারণ আরবের ঘোড়া অত্যন্ত শক্তিশালী ও দীর্ঘ সময় পরিশ্রমেও সহজে ক্লান্ত হয় না। আরবের ইতিহাস মতে সর্বপ্রথম ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিলেন হজরত ইব্রাহীমের (আ) পুত্র ইসমাইল (আ)।[২৫] আরবদের কাছে অত্যান্ত ভালোবাসার প্রানি ছিল এই ঘোড়া। ভালোবাসার পরিমাণ এমন যে নিজের সন্তান পানির পিপাসায় চিৎকার করলেও পানির শেষবিন্দুটিও ঘোড়ার জন্য রেখে দিতো। পারদিন সকালে ঘোড়াকে পেটভরে খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনে সারা রাত সপরিবার অভুক্ত থাকতো। এছাড়া ইসলাম ও হিন্দু উভয় ধর্মেই ঘোড়া কল্যাণকর প্রাণী বলে বর্ণিত হয়েছে। হজরত মোহাম্মদ (স) বলেছেন- "ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে। আখেরাতের পুরস্কার ও গনিমতের মালও তার অন্তর্ভুক্ত।"[২৬]

হজরত মোহাম্মদের (স) জন্মের অনেক আগে থেকে আরবদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল- 'যোদ্ধার ভাগ্য তার ঘোড়ার কপালে লেখা থাকে।' এই একই কথা ভারতীয়দের মুখে প্রচলিত ছিল এবং তারাও বিশ্বাস করতো- 'যুদ্ধের জয়-পরাজয় যোদ্ধার ঘোড়ার কপালে লেখা থাকে।' ভারতীয়দের কাছে ঘোড়া গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ পূরাণসমূহে উল্লেখ আছে কলিযুগের অন্তিম অবতার অর্থাৎ কল্কি অবতারের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুষ্টের দমন করবেন।[২৭] এজন্য ভারতীয়দের কাছে ঘোড়া ছিল পছন্দনীয় এবং সম্মানের প্রাণি। তাছাড়া অনেক আগে থেকেই ভারতীয়রা বাহন হিসেবে ঘোড়া ব্যবহার করতো। এশিয়ার ঘোড়াগুলো সর্বপ্রথম বশ মানিয়েছিল আর্যরা, তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল ঘোড়াটানা রথে চড়ে। আর্যদের বিজয় অভিযান সফল হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ঘোড়াটানা রথের।[২৮] ভারতে তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার পর তারা জংলি ঘোড়া বশ মানিয়ে ব্যবহার বাড়াতে থাকে। এছাড়া আরবের ঘোড়া যে অনেক বেশি শক্তিশালী এটি ভারতীয়রা জানতো, তাই উচ্চদামে আরব বণিকদের কাছে থেকে শক্তিশালী আরবীয় ঘোড়া ক্রয় করতো।

মালাবারের বন্দর পার হয়ে আরবের জাহাজ প্রবেশ করতো হারগিন্দ বা বহর-ই-হিন্দে অর্থাৎ বর্তমান ভারত মহাসাগরে। ভারত মহাসাগরে সিকি মাইল পর পর ছিল অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ, এই দ্বীপগুলোই মূলত হারগিন্দ এবং লারওয়াই অর্থাৎ ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের সীমানা হিসেবে বিবেচিত ছিল এবং প্রায় সব দ্বীপেই জনবসতি ছিল। এখানকার লোকজন জাহাজ নির্মাণ এবং কারুশিল্পে অনেক দক্ষ ছিল, সামুদ্রিক মাছ ও নারকেল ছিল তাদের প্রধান খাবার। বিভিন্ন স্থানের বণিকরা এখানে এসে তিমি মাছের সুগন্ধি তেল এবং নারকেল কিনতো। বণিকদের সাথে তাদের লেনদেনের মাধ্যম ছিল সামুদ্রিক কড়ি।

এই দ্বীপপুঞ্জের শেষ দ্বীপ ছিল শরনদ্বীপ অর্থাৎ বর্তমান শ্রীলংকা। শরনদ্বীপ আকারে ভারত মহাসাগরের যে কোন দ্বীপের চেয়ে বড়। এ দ্বীপের পর্বতে চুনী, নীলা ও গোমেদ পাওয়া যেতো এছাড়া এর উপকূলে পাওয়া যেতো প্রচুর পরিমাণে মুক্তো। আরব বণিকরা এই রত্ন পাথর কমমূল্যে ক্রয় করে পারস্যে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করতো। পারস্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদে শোভা পেতো শরনদ্বীপ থেকে নিয়ে যাওয়া মূল্যবান রত্নপাথর। আরবরা এখানেও উচ্চমূল্যে তাদের ঘোড়া বিক্রয় করতো।

শরনদ্বীপ যাওয়ার পূর্বে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য দ্বীপের কথা জানা যায় আরবীয় ইতিহাসে। ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখিত একটি বিশেষ দ্বীপ 'রামনি'; এখানকার মানুষের প্রধান খাবার ছিল নারকেল। রামনির কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে দেনমোহর হিসেবে শত্রুপক্ষের কারো মাথা কেটে এনে দিতে হতো। যতো ইচ্ছে বিয়ে করা যেতো কিন্তু শর্ত ঐ একটাই, প্রতিবার বিয়ের সময় কনের শত্রুপক্ষের একজনের মাথা কেটে এনে দিতে হবে। এই দ্বীপে উন্নতমানের কর্পূর ও হাতি পাওয়া যেতো। বণিকদের জাহাজ আসলেই এখানকার অধিবাসীরা ছোট ছোট নৌকায় করে তিমির সুগন্ধি তেল, নারকেল, হাতির দাঁত, কর্পূর ও মুক্তো নিয়ে আসতো।

আরব বণিক ও পর্যটকদের লিখিত ইতিহাসে 'আন্দআলুমান' নামে একটি গুচ্ছদ্বীপের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দ্বীপের অধিবাসীদের গায়ের রং ছিল কৃষ্ণবর্ণের এবং এরা ছিল নরমাংসভোজী। সম্ভবত এদের সাথে আরব বণিকদের বাণিজ্য খুব কম ছিল অথবা ছিলোই না; যার কারণে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য আরবদের কাছে নেই।

'লেন্দজেবালুস' নামে একটি দ্বীপপুঞ্জ আরবদের যাত্রা পথে ছিল, তারা এখানে

যাত্রা বিরতী করতো খাবার পানির জন্য। এখানকার লোকদের গায়ের রং ছিল সাদা, তাদের দাড়ি-গোঁফ ছিলো না। তারা গায়ে কোন কাপড়ও পড়তো না। বণিকদের জাহাজ দেখলে তারা তক্তায় করে নারকেল ও কলা নিয়ে আসতো এবং লোহার বিনিময়ে এগুলো লেনদেন করতো। অনেক সময় তারা কিছু না দিয়েই লোহা কেঁড়ে নিয়ে যেতো। আর এই দৃশ্য তাকিয়ে দেখা ছাড়া বণিকদের কিছুই করার থাকতো না।

'লেন্দজেবালুস' থেকে কিছু দূর এগোলেই 'কালুহবার' বা জাভা। কালুহবার থেকে আরবরা খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করতো। এখান থেকে দশ দিনের পথ 'বাতুম', 'বাতুম' থেকে আরও দশ দিনের পথ 'কাদার', 'কাদার' থেকে পনের দিনের পথ 'সিনফ'; তার পরের দশ দিনে জাহাজ পৌঁছায় 'সান্দের ফাওলাত' বা সিঙ্গাপুর। বাতুম, কাদার ও সিফন বন্দরে বণিক জাহাজ থামতো শুধুমাত্র খাবার ও পানীয় জল নেয়ার জন্য। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু ছিল না; কিন্তু সান্দের ফাওলাত বা সিঙ্গাপুরে তারা বেশ কিছু দিন অবস্থান করতো। এখানে তারা জাহাজ মেরামত করতো এবং পর্যাপ্ত খাবার পানি মজুদ করতো, কারণ সেখান থেকে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য চীনের খাফুয়া বন্দর বা ক্যান্টন বন্দর যেতে সময় লাগত এক মাস এবং জিনজি অর্থাৎ চীন সাগরে আর কোন বন্দর ছিল না থামার মতো।[২৯]

রেশম পথের নৌপথে আরবদের এই দীর্ঘ যাত্রাপথ স্থল পথের চেয়ে একেবারেই কম ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তা কিন্তু নয়। এই দীর্ঘ পথে সামুদ্রিক ঝড়, জাহাজ ডুবি, ডাকাতের আক্রমণ ছিলো স্বাভাবিক বিষয়; এছাড়া আরব বণিকদের বর্ণিত আশ্চর্যজনক কিছু ঘটনা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। বর্তমান ভারত, শ্রীলংকা এবং চীনের মধ্যবর্তী সাগরে সে সময় প্রচুর পরিমাণে বড় বড় মাছ ছিল। মাছগুলো এতো বড় ছিলো যে তাদের আঘাতে জাহাজ ভেঙ্গে যেতো। মাছ যেন জাহাজের কাছে আসতে না পারে এজন্য বণিকরা রাত্রিবেলায় ক্রমাগত ঘণ্টা বাজাতো। লেন্দজেবালুস দ্বীপপুঞ্জে আরব বণিকরা পাখির বড় বড় ডিম দেখেছিল। এই ডিম খাওয়ার কারণে দানব আকৃতির পাখি পায়ে করে পাথর এনে তাদের জাহাজে ফেলেছিল বলে আরব বণিক সুলেমানের বর্ণনায় পাওয়া যায়। 'আরব্য রজনী' তে উল্লেখিত সিন্দাবাদ এই আরব-চীন নৌপথের নাবিক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তার নৌবাণিজ্যের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ঘটনার সাথে আরও কিছু কল্পকাহিনী মিশিয়ে 'আরব্য রজনী' লেখা হয়েছিল।

আরব বণিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রাচীন বন্দর ছিল বাংলাদেশের

শাতি-উল-গঙ্গা ও সালাহত, যা বর্তমানে চট্টগ্রাম ও সিলেট নামে পরিচিত। বিশেষত চট্টগ্রাম ঐতিহাসিক ভাবে অনেক প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী ছিলো। শুধু আরব বণিক নয় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশের বণিক এবং পর্যটক এদেশে এসেছেন, আর এদেশে নৌপথে আসার গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার ছিল শাতি-উল-গঙ্গা বা বর্তমান চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামে বহু আগে থেকেই যখন যে দেশের পর্যটক এসেছেন তারা তাদের লিখিত ভ্রমণ কাহিনীতে তাদের মতো করেই চট্টগ্রামের নামকরণ করেছেন। ইবনে বতুতা তার সফরনামায় চট্টগ্রামের নাম লিখেছেন সাতকাওয়ান। তুর্কি নাবিক সিদি আলী চেলেবি লিখেছেন শাতিজাম। বিভিন্ন সময়ে আগত চৈনিক পরিব্রাজকরা তাদের লিখিত ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছে চেহ-টি-গান, চাতি কিয়াং, চাহটি গান ইত্যাদি। পর্তুগিজ নাবিকেরা লিখেছেন সাটিগান। ফরাসি পর্যটক পিরার্ড ডি লাভার তার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখছেন চাটিকান।[৩০] এই নামগুলোই পরিবর্তন হতে হতে বর্তমানে চট্টগ্রাম নাম ধারণ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। তবে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় আরাকানের একটি শিলালিপিতে। সেখানে আবিষ্কৃত সিথং মন্দির লিপিতে বৈশালি রাজ্যে চন্দ্র পদবিধারী একটি রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিলালিপি মতে এই রাজবংশের নয় জন রাজা ৭৮৮-৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা সু-লা-তাইং-সান্দায়া বঙ্গ জয়ের অভিযান চালান। বঙ্গ বিজয় করে তিনি তার রাজ্যে একটি বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এই স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা ছিল 'চেৎ-তা-গং'। 'চেৎ-তা-গং' শব্দের অর্থ যুদ্ধ করা ভাল নয়।[৩১] ধারণা করা হয় এখান থেকেও চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হতে পারে। আরব বণিকরা চট্টগ্রামকে বলত শাতি-উল-গঙ্গা অর্থাৎ গঙ্গার শেষ প্রান্ত।[৩২]

আরব বণিকদের বর্ণিত শাতি-উল-গঙ্গা বা বর্তমান চট্টগ্রাম নামের সঠিক উৎস এবং এখানকার মানব বসতি কবে থেকে শুরু তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। ইতিহাস মতে প্রাচীন মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পূর্ব ভারতের যে তিনটি রাজ্য অংশগ্রহণ করেছিল তার একটি হলো কিরাত রাজ্য। বর্তমান ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা, মায়ানমারের আরাকান এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম নিয়ে ছিল এই কিরাত রাজ্য। এছাড়া জনশ্রুতি আছে মহাকাব্যের যুগে রামায়নের মূলচরিত্র রামচন্দ্র তার স্ত্রী সীতাকে নিয়ে এই শাতি-উল-গঙ্গা বা চট্টগ্রামে এসেছিলেন। চট্টগ্রামের রামগড়, রামকোট ও সীতাকুন্ড নামগুলো তাদেরই স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে আছে।[৩৩] প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে বেশ কয়েকটি ছোট বড় সমুদ্র বন্দর থাকলেও আরব বণিকদের সবচেয়ে বেশি সমাগম ছিল তাম্রলিপ্তি, গঙ্গাবন্দর এবং দেবগ্রাম বন্দরে। এই তিনটি ছিল প্রাচীন বাংলার বৃহৎ সমুদ্রবন্দর। তাম্রলিপ্তি বন্দর ছিল পূর্বভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বন্দর। মহাভারতেও এই বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়; মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম বীর ভীম তার বিজয় অভিযানে তাম্রলিপ্তি রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। তাম্রলিপ্তির পরাজিত রাজা পঞ্চপাণ্ডবের যুধিষ্ঠিরকে কর প্রদানে বাধ্য হয়েছিল।[৩৪] গঙ্গা নদী ভারতের মুর্শিদাবাদে এসে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে মূলধারা ভগীরথী (আদি গঙ্গা) নাম নিয়ে বর্তমান ভারতের উড়িষ্যা দিয়ে সাগরে এসে মেশে। এই ভগীরথীর মোহনায় ছিল তাম্রলিপ্তি বন্দরের অবস্থান। প্রচুর পরিমাণে দাম (কচুরিপানা) এখানে জমাট বেঁধে থাকায় স্থানীয়রা একে দামলিপ্তি বলতো। অষ্টম-নবম খ্রিষ্টাব্দে নাব্যতা হারিয়ে ফেলায় তাম্রলিপ্তি বন্দর বিলুপ্ত হয়ে যায়।

গঙ্গা নদীর আরেকটি শাখা পদ্মা (ছোট গঙ্গা) নামধারণ করে বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুরে এসে মেঘনা নদীর সাথে মিশে ভগীরথীর মোহনা থেকে বহুদূরে সাগরে মিলিত হয়েছে। একসময় এটিই হয়ে যায় গঙ্গার মূল প্রবাহ[৩৫] এবং এই গঙ্গা মোহনার আশেপাশেই ছিল গঙ্গাবন্দর। তাম্রলিপ্তি বন্দর বিলুপ্ত হওয়ায় আরব বণিকদের গঙ্গাবন্দরে যাতায়াত বেড়ে যায়। আরব বণিকরা গঙ্গাবন্দর দিয়েই সিলাহাত বা সিলেটে যেতো এবং বর্তমান বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে হলে গঙ্গাবন্দর দিয়েই যেতে হতো। রোমান ইতিহাসবিদ এবং বিশ্বের প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতা প্লিনি ৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তার লিখিত 'পেরিপ্লাস আফ দ্য ইরিথেরিয়ান সি' গ্রন্থে প্রাচীন গঙ্গাবন্দর নামে একটি বাণিজ্যকেন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, "গঙ্গা নদীর তীরে এই নদীর নামেই অর্থাৎ গঙ্গাবন্দর নামে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এখান থেকে চন্দনকাঠ, মুক্তো ও অতি মিহি গাঙ্গেটিক নামের মসলিন বস্ত্র রপ্তানি হতো। এই বন্দরের খুব কাছে স্বর্ণখনি ছিল এবং এখানে ক্যালটিস নামে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। এই নদীর ঠিক অপর পাড়ে মোহনার সন্নিকটে সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপ ছিল। উদীয়মান সূর্যের নীচে অবস্থিত সর্ব পূর্বে বসতি এলাকা ছিল এটি। এই দ্বীপটির নাম ছিল শ্রীশে।" আজ থেকে দুহাজার বছর আগে প্লিনি লিখিত গঙ্গাবন্দর নামক বন্দর শহরের অবস্থান সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারণ করা মুশকিল, তবে ধারণা করা যায় শ্রীশে বর্তমান সন্দ্বীপ এবং এর বিপরীত পাশেই অবস্থান ছিল প্রাচীন গঙ্গাবন্দরের।[৩৬]

তাম্রলিপ্তি বন্দর বিলুপ্ত হওয়ায় গঙ্গাবন্দরের সাথে দেবগ্রাম নামে আরেকটি বন্দর বণিকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দেবগ্রাম শব্দের অর্থ হলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত গ্রাম। বন্দরটি তখন হিন্দু অধ্যুষিত একালায় হওয়ায় নামকরণটি তাদের ধর্মমতে হয়েছে। বর্তমান কর্ণফুলি নদীর মোহনা থেকে আট-

দশ মাইল ভেতরে ছিল দেবগ্রাম বন্দর। সামুদ্রিক ঝড় বা জলোচ্ছাস থেকে জাহাজ এবং পণ্যের আরৎগুলো নিরাপদে রাখার জন্য বন্দরটি মোহনা থেকে দূরে ছিল। প্রাচীন হরিকেল রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান বন্দর ছিল এটি। হরিকেল রাজ্য সামরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ না হওয়ায় বর্তমান কুমিল্লার লালমাঈ থেকে চট্টগ্রামের বাঁশখালি সম্পূর্ণ এলাকা অরক্ষিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই হরিকেল রাজ্যের পতন হলে চক্রশালা এবং দেবগ্রাম নামে দুইটি আলাদা রাজ্যের উত্থান হয়। হরিকেল রাজ্যের উত্থান পতনের কারণে দেবগ্রাম বন্দরের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পরেনি। দেবগ্রাম বন্দরের কারণেই এই নতুন রাজ্যটির নামও দেবগ্রাম হয়েছিল।[৩৭] বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দর এই দেবগ্রাম বন্দরের অন্তর্ভূক্ত ছিল। দেবগ্রাম বন্দরের আশেপাশেই জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল এবং বিভিন্ন দেশের বণিকরা এখানে এসে তাদের জাহাজ মেরামত করতো।

পঞ্চম শতাব্দী থেকেই আরব এবং চীনা বণিকরা দেবগ্রাম বন্দরে যাওয়া আসা শুরু করে। রসুলের (স) সহধর্মিনী খাদিজাতুল কুবরার (রা) বাণিজ্য জাহাজ এই বন্দরেই এসে নোঙ্গর ফেলেছিল, শুধু বাণিজ্যের জন্য নয় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসা সাহাবীদের জাহাজ বাংলায় এসে প্রথম নোঙ্গর করেছিল চট্টগ্রামের এই দেববন্দরে। আরব বণিকরা চট্টগ্রাম থেকে যে পণ্যগুলো নিয়ে যেতো তার মধ্যে অন্যতম ছিল মসলা, সুগন্ধি তেল (আতর), চন্দনকাঠ, মুক্তো, উন্নত মানের কাপড়, কৃষিজাত পণ্য এবং হাতির দাঁত।

মালাবারের মতো না হলেও চট্টগ্রামের আশেপাশের এলাকাগুলোতে প্রচুর পরিমানে মসলা চাষ হতো। আরব, চীন এবং ইউরোপের বণিকরা তাদের জাহাজ বোঝাই করে এখান থেকে মসলা তাদের দেশে নিয়ে যেতো। শুধু রান্নার উপকরণ নয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বৈদিক যুগ থেকেই প্রাচীন ভারতে মসলার ব্যবহার ও উৎপাদন হতো। ততকালীন সময়ে ইউরোপীয়রা শুধু রান্নার উপকরণ হিসেবে মসলা ব্যবহার করতে জানতো এবং আরবরা কেবলমাত্র দু চারটি মসলার ভেষজ গুনাগুণ জানতো তাছাড়া তাদের প্রচলিত খাদ্য তালিকায় মসলার ব্যবহার ছিল খুব কম। তারা মূলত মসলা নিয়ে যেতো চীন বা ইউরোপে বিক্রয়ের জন্য এবং মসলা বিক্রয়ের জন্য আরবদের সবচেয়ে বড় বাজার ছিল ইউরোপ। ৪১০ খ্রিষ্টাব্দের গথ উপজাতি যখন রোম অবরোধ করে, তারা অবরোধ তুলে নেয়ার শর্তে দাবি করেছিল তিন হাজার পাউন্ড গোলমরিচ।[৩৮] এথেকে বোঝা যায় ইউরোপিয়ানদের কাছে মসলার গুরুত্ব কেমন ছিল। গোলমরিচের উচ্চমূল্যের কারণে তখন তা সোনার চেয়েও বেশি দামি ছিল। রোমান সাম্রাজ্যে

বাংলার এক সের গোল মরিচের দাম ছিল ত্রিশ দিনার অর্থাৎ ত্রিশটি স্বর্ণমুদ্রা।[৩৯]

ইউরোপীয়রা এক পর্যায়ে নিজেরাই মসলা সংগ্রহের জন্য নৌবাণিজ্যে নামে। ১৬০১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মসলা সংগ্রহের জন্য সাগরে জাহাজ ভাসায় এবং আড়াই বছর পর দশ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউন্ড গোলমরিচ নিয়ে ইংল্যান্ডে ফেরে।[৪০] এই ব্যবসায় লাভের পরিমাণও ছিল এতো বেশি যে ডাচদের প্রথম জাহাজটি মালাক্কা থেকে লবঙ্গ ভর্তি করে ফেরার পর প্রথম চালান বিক্রয়ে তারা মুনাফা লাভ করেছিল ২৫ গুণ। অবশ্য আঠারো শতকের শুরু থেকে তাদের এই লাভের অনুপাত কমা শুরু করে।[৪১]

চট্টগ্রাম থেকে কি পরিমাণ মসলা নিয়ে যেতো তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় কর্ণফুলী নদীর নামকরণ থেকে, জনশ্রুতি আছে আরাকান রাজকন্যা চট্টগ্রামের এক যুবকের প্রেমে পরে। কোন এক পূর্ণিমা রাতে সেই যুবক কর্ণফুলী নদীর তীরে বসে রাজকন্যার কানে একটি ফুল গুঁজে দেয়; কিন্তু হঠাৎ সেই ফুল নদীতে পরে গেলে রাজকন্যা ফুলটি ধরার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পরে। তারপর সেই যুবকও রাজকন্যাকে ধরার জন্য নদীতে ঝাঁপ দেয়। এতে দুজনই নদীতে হারিয়ে যায়; এ কারণে রাজকন্যার কানের ফুল থেকে নাম হয়েছে কর্ণফুলী। গল্প হিসেবে এইটি সুন্দর হলেও ইতিহাস বলে অন্য কথা। ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় আরব বণিকদের লবঙ্গ বোঝাই একটি জাহাজ কর্ণফুলী নদীতে ডুবে গিয়েছিল। আরবীতে লবঙ্গকে বলা হয় করণফুল; আর সেই করণফুল থেকেই অপভ্রংশ হয়ে নদীটির নাম হয়েছে কর্ণফুলী।[৪২] চট্টগ্রাম বন্দর মসলা বাণিজ্যে কতোটা সমৃদ্ধ ছিল তার ধারণা পাওয়ার জন্য সচেতন পাঠকের জন্য এই ঘটনাই যথেষ্ট।

প্রাচীন বাংলায় সুগন্ধি তেল (আতর) উৎপাদন করা হতো আগড় ও চন্দনকাঠ থেকে। আরবদের কাছে আকর্ষণীয় পণ্য ছিল চন্দনকাঠের সুগন্ধি তেল এবং চন্দনকাঠ। রসুলের (স) সহধর্মিনী খাদিজাতুল কুবরা (রা) ছিলেন মক্কার তিন জন প্রসিদ্ধ মহিলা ব্যবসায়ীর মধ্যে একজন; তাঁর ব্যবসায়িক পণ্যের মধ্যে হিন্দুস্থানের সুগন্ধি তেলও ছিল। ইসলাম প্রচারের আগে থেকেই আরবরা চন্দনকাঠের সুগন্ধি তেল এবং চন্দনকাঠ সংগ্রহ করতো সৌখিনপণ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য। ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে হজরত মোহাম্মাদ (স) চন্দন কাঠ ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য সাহাবীদের উৎসাহিত করলে এটির প্রতি আকর্ষণ বহুগুণ বেড়ে যায়। ভারতবর্ষের চন্দনকাঠ ব্যবহারের কথা হাদিসেও পাওয়া যায়।

“হজরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত- উম্মে কায়েস বিনতে

চন্দন গাছ সবচেয়ে বেশি জন্মাতো আসামে

মেহছান আসাদিয়া আসাদ খোযায়মাহ গোত্রের মহিলা ছিলেন। প্রথম হিজরতকারি মাহিলাদের যারা নবী করীম (স) এর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিল, তিনি ছিলেন তাদের একজন। তিনি বলেন, তিনি তার ছেলেকে নিয়ে নবী করীম (স) এর নিকট এলেন। তার ছেলের আল জিহ্ববা ফোলার কারণে তালু দাবানো হয়েছিল। নবী করীম (স) বললেন, কেন তোমরা নিজেদের সন্তানদের তালু দাবিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে থাকো, উদে হিন্দি (ভারতীয় কাঠ) ব্যবহার করো। কেননা, এতে সর্ব প্রকার রোগের উপশম হয়। এগুলোর মধ্যে একটি হলো পাঁজরের ব্যাথা।" [৪৩]
উদে হিন্দ বা কোসতে হিন্দ হচ্ছে কোসত নামে ভারতীয় সাদা চন্দন কাঠ যা ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। রাসুল (স) কোসতে হিন্দের ঔষুধিগুন বলার পর স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় চন্দন কাঠের প্রতি সাহাবীদের আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। উন্নত মানের চন্দন গাছ সবচেয়ে বেশি জন্মাতো কামতা বা কামরূপে অর্থাৎ বর্তমান আসামে। সিলাহাত বন্দর হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে পনের-বিশ দিনের দূরত্ব পথে কামরূপ থেকে চন্দনকাঠ সংগ্রহ করা হতো।[৪৪]

কয়েক হাজার বছর আগে থেকে মুক্তোর অলঙ্কার অভিজাত শ্রেণির লোকেরা ব্যবহার করতো। প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদে মুক্তোচূর্ণ সেবন করার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা তার সৌন্দর্য অটুট রাখার জন্য গোলাপী মুক্তো সেবল করতেন বলে ইতিহাসে প্রচলিত আছে। প্রাচীন বাংলায় সাগর উপকূল থেকে প্রচুর পরিমাণে মুক্তো আরোহণ করা হতো। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত প্রায় সবগুলো দ্বীপপুঞ্জেই মুক্তো সংগ্রহ করা হতো। তবে ভাল মানের গোলাপী মুক্তো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং বর্তমান কক্সবাজার উপকূলে বেশি পাওয়া যেতো। সম্রাট আকবরের রত্নাগারেও প্রচুর পরিমাণে মুক্তোর মজুদ ছিল। তার সময়ে মুক্তোকে মান অনুসারে ষোলটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, প্রথম শ্রেণীর একটি মুক্তোর দাম ছিল ত্রিশ মোহর (স্বর্ণমুদ্রা) বা তার চেয়েও বেশি। প্রথম শ্রেণীর বিশটি মুক্তো একসাথে গেঁথে মালা করে রাখা হতো।[৪৫] আরব বণিকরা তারো অনেক আগে থেকেই বাংলায় এসে মুক্তো নিয়ে যেতো এবং পারস্যে নিয়ে তা বিক্রয় করতো। পারস্য সম্রাটের পানপাত্রে খোঁচিত ছিল এই বাংলা থেকে নিয়ে যাওয়া গোলাপি মুক্তো।

প্রায় চারশত খ্রিষ্টপূর্ব থেকে এদেশে কার্পাস ও রেশমের সুতো দিয়ে দুই ধরনের মূল্যবান কাপড় তৈরি করা হতো। কার্পাসের সুতোয় বানানো হতো মসলিন কাপড় এবং রেশমের সুতোয় সিল্ক। গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে অত্যন্ত মিহি সুতো দিয়ে মসলিন নামের এই মিহি কাপড় তৈরি করা হতো। মসলিন কাপড় এতোটাই

মসলিন কাপড়- এর বিবরণ

সম্রাট আওরঙ্গজেব ও শাহজাহান মসলিন কাপড় ভারতের বাহিরে রপ্তানি নিষিদ্ধ করে

মিহি হতো যে ছোট্ট একটি নস্যিদানিতে বিশ গজ মসলিন কাপড় ভাঁজ করে সহজেই রাখা যেতো। এক গজ প্রস্থ এবং বিশ হাত লম্বা কাপড় ছোট্ট একটি আংটির মধ্য দিয়ে অনায়াসে পার করা যেতো। দুই হাত প্রস্থ এবং ত্রিশ হাত লম্বা একটি কাপড়ের ওজন ছিল মাত্র চার-পাঁচ তোলা। আট হাত প্রস্থ ষাট গজ লম্বা কাপড় মাত্র দুই বিঘত লম্বা বাঁশের ফাঁকা জায়গায় করে বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়া হতো। পারস্য সম্রাটের দূত মোহাম্মাদ আলি বেগ ভারতবর্ষ থেকে পারস্য ফিরে যাওয়ার সময় পারস্য সম্রাটের জন্য ষাট হাত লম্বা মসলিন কাপড় ছোট্ট একটি নারকেলের খোলের মধ্যে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মসলিনের বৈশিষ্ট্যভেদে বিভিন্ন ধরণের নাম ছিল, যেমন- সঙ্গতি, সারবতি, শবনম, তনজেব, নয়নসুখ, আবরুয়া, সরকন্দ, বদনখাসা ইত্যাদি।[৪৬] এছাড়া আরো কিছু সুন্দর অর্থপূর্ণ ছিল- বুনট করা বাতাসের জাল, চলন্ত নদীর স্রোত, পরীর স্বপ্ন, সাঁঝের লীলা, অপ্সরা লীলা ইত্যাদি।[৪৭] কিছু মসলিন ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, আবরুয়া মসলিন পানিতে ভেজালে পানির সাথে একেবারে মিশে যেতো এবং পানি থেকে না তোলা পর্যন্ত কাপড় চেনা যেতো না। শবনম মসলিন শিশিরে ভেজা ঘাসে ভেজালে ঘাসের সাথে তা মিশে থাকতো, ঘাস বলেই মনে হতো। নবাব আলিবর্দী খাঁ পরীক্ষা করার জন্য একটি শবনম মসলিন পানিতে ভিজিয়ে ঘাসের সাথে মেলে রাখেন, একটি গরু ঘাস খেতে খেতে বিভ্রান্ত হয়ে শবনম মসলিনটি খেয়ে ফেলেছিল।[৪৮]

আরব বণিকরা বাংলার বুটাতোলা নামের মাসলিনের আরবী নাম দিয়েছিল কাসিদা। তাদের কাছে কাসিদা নামের এই মাসলিন বেশ জনপ্রিয় ছিল। তারা এই মসলিন নিয়ে গিয়ে ইউরোপ এবং পারস্যে বিক্রয় করতো এবং পারস্যবাসী এটি পাগড়ি হিসেবে ব্যবহার করতো। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে মসলিন ইউরোপিয়ানদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, অভিজাত শ্রেণির ঘরে ঘরে মসলিন কাপড় ছিল। এর কদর সবচেয়ে বেশি ছিল রোমান সাম্রাজ্যে। আরবদের মধ্যে বিত্তবানরা মসলিন কাপড়ের পাগড়ি ব্যবহার করতো। সম্রাট শাজাহান এবং আওরঙ্গজেব চাইতেন না মসলিন ভারতবর্ষের বাহিরে রপ্তানি হোক। তাই তারা মসলিন রপ্তানি নিষিদ্ধ আইন জারি করেন।[৪৯] যার কারণে পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ থেকে মসলিন নিয়ে যাওয়া আরব বণিকদের জন্য কঠিন হয়ে পরে।

ধারণা করা হয় খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে চীনে সর্বপ্রথম রেশম চাষ শুরু হয়েছিল; কিন্তু তারা রেশম চাষের পদ্ধতি দীর্ঘ শতাব্দী গোপন রেখেছিল। এর অনেক পর

সর্বপ্রথম চীন রেশমের কাপড় চাষ শুরু করেন।

বাংলায় রেশমের কাপড়ের ইতিহাস

বাংলায় 'পত্রোর্ণ' অর্থাৎ পাতার রেশম নামে উন্নত মানের রেশমি বা সিল্ক কাপড় বাংলায় তৈরি শুরু হয়। এই রেশমের চাষ সবার আগে শুরু হয় বাংলা এবং মগধে। বাংলায় রেশম পোকাকে খাওয়ানো হতো নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল ও বট পাতা। একেক গাছের পোকা থেকে পাওয়া যেতো একের রঙের রেশম। নাগবৃক্ষের পোকা থেকে হলুদ, লিকুচের পোকা থেকে গমের রঙের, বকুলের পোকা থেকে সাদা রঙের এবং বটের পোকা থেকে ননীর রঙের রেশম হতো। চীনে রেশম হতো তুঁত গাছে। তুঁত গাছ থেকে সাদা রেশম হতো এবং একে রঙিন করার জন্য আলাদা রং ব্যবহারের প্রয়োজন হতো।[৫০] সময় বদলের সাথে সাথে চীনের তুঁত গাছের রেশম বাংলায় স্থান করে নেয় এবং বাংলার নিজস্ব উন্নত রেশম হারিয়ে যায়। আরব বণিকরা চীন এবং বাংলা থেকে সিল্কের কাপড় নিয়ে যেতো এবং ইউরোপে উচ্চদামে বিক্রয় করতো। কথিত আছে রোমান সম্রাট আরিলিয়ানের স্ত্রী রেশমি কাপড় ব্যবহার করতে চাইলে উচ্চমূল্যের কারণে সম্রাট তা কিনে দিতে পারেননি। এছাড়া তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান সম্রাট হেলিওগেবলস রেশমি কাপড় ব্যবহার করার কারণে ব্যয়শীলতার জন্য তার মন্ত্রী সভার লোকজন তকে তীরস্কার করেছিল।[৫১] ঘটনা দুটির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটদের কাছেও রেশমি কাপড় যে পছন্দনীয় ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলার মানুষের কাছে রেশমি কাপড় যে আকর্ষনীয় ছিল তা কিছু বণিক ও পর্যটকের লিখিত ভ্রমণ কাহিনীতেও পাওয়া যায়। ১৬৪০ সালে বাংলা সফরকারী অগাষ্টিয়ান সন্ন্যাসি সেবাসতিয়াও মানরিক তার ভ্রমণ কাহিনীতে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সফরকালীন সময়ে তার জাহাজ উড়িষ্যা উপকূলে ঝড়ে ভেঙ্গে গেলে তিনি স্থলপথে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি তার দলবল নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গঙ্গা নদীর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন; কিন্তু উড়িষ্যা সীমান্তে জলাভূমিতে প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে তারা একটি হিন্দু পল্লীর গোয়ালঘরে আশ্রয় নেন। পরদিন তার সাথের কয়েকজন মুসলিম সঙ্গী কয়েকটি ময়ূর ধরে জবাই করে রান্না করে। ঘটনাটি জানাজানি হলে হিন্দু পল্লীর লোকেরা তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়; কারণ ময়ূর হিন্দুদের কাছে পবিত্র প্রাণী, তাই ময়ূর হত্যা করা মহাপাপ। মানরিক আসন্ন বিপদ আঁচ করতে পেরে তার সাথের ভারতীয় হিন্দু গাইডকে কিছু গোলমরিচ উৎকোচ দিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। একজন ভারতীয় কে গোলমরিচ দেয়া এবং মায়ের কাছে মাসির বাড়ির গল্প করা একই কথা, সম্ভবত এই কারণে গোলমরিচের ঝাল ইউরোপীয়দের মন জয় করতে পারলেও মানরিকের ভারতীয় হিন্দু গাইডের মন জয় করতে পারেনি। সেই গাইড মানরিকের বিরুদ্ধে গ্রাম প্রধানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ময়ূর হত্যার

সেবাসতিয়াও মানরিক ও তার দলের ময়ূর জবাই এর ঘটনা

হাত কাটার বিধান হিন্দু সমাজে

অভিযোগ দায়ের করে। তখন নিয়ম অনুসারে ময়ূর হত্যাকারীর অঙ্গছেদ অর্থাৎ একটি হাত কাটার বিধান ছিল। মানরিক এবার নতুন উপায় বের করেন। তার কাছে থাকা চীনের একটি রেশমি কাপড় গ্রাম প্রধানের স্ত্রীকে উপহার দেন এবং এবার তিনি সফল হন। গ্রাম প্রধান তার স্ত্রীর আবদারের কারণে অভিযুক্তদের হাত না কেটে চাবকানো (দু চারটে চড় থাপ্পড়) দিয়ে ছেড়ে দেন।[৫২] রেশমি কাপড় তৎকালীন ধর্মীয় স্পর্শকাতর বিষয়েও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল এই ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়।

বাংলায় কৃষিজাত ফসলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হতো ধান। গম এবং যব আর্যরা উত্তরভারত থেকে বাংলায় এনেছিল। কিন্তু ধানের চাষ আর্যদের অনেক আগে শুরু করে অষ্ট্রিক জাতি। সর্বপ্রথম ধানের চাষ এই বঙ্গদেশেই হয় এবং এখান থেকে ধান যায় চীনে।[৫৩] ধানের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল শালিধান। বালাম নামে একটি ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। বঙ্গদেশের বণিকরা বেতের তৈরি বালাম নামে নৌকায় করে এই ধান আশে পাশের দেশে বিক্রয় করতো বলে এই ধানের নামও হয় বালাম।[৫৪] আরব বণিকরা শুকনো ধান নিয়ে গিয়ে সিংহল, সুমাত্রা এবং চীনে বিক্রয় করতো। কিন্তু এই দেশগুলোতে ধানের উৎপাদন ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় আরবদের ব্যবসায়িক পণ্যের তালিকা থেকে এক সময় বাদ পরে যায়।

কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধানের পরেই স্থান ছিল ইক্ষু বা আঁখের। বাংলায় একসময় প্রচুর আঁখ জন্মাত এবং মেয়েরা আঁখের ছায়ায় বসে ধান মাড়াই করতো। পুন্ড্রে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে 'পৌন্ড্রক' নামের বিশেষ এক ধরনের আঁখ জন্মাত। বর্তমান ভারতে 'পোড়িয়া' নামের যে উন্নত জাতের আঁখ চাষ হয় তা মূলত পৌন্ড্রক আঁখের বর্তমান রূপ। মিষ্টি গুড় তৈরির জন্য যে শুধু আঁখ চাষ হতো তা নয়, প্রাচীনকাল থেকেই আঁখ মুখরোচক খাবার হিসেবে সব শ্রেণির লোকেরা খেতো। হিমালয়ের কার্তিক নগরের রাজা রামগুপ্তকে হত্যার সময় তিনি আঁখ খাচ্ছিলেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। রাজা রামগুপ্ত তার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য কে হত্যা করতে চাইলে বিক্রমাদিত্য বিষয়টি আঁচ করতে পেরে ছদ্মবেশ ধারণ করেন। বিক্রমাদিত্য সন্ন্যাসির ছদ্মবেশে রাজা রামগুপ্তের প্রাসাদে যান এবং ঐ সময় রাজা রামগুপ্ত ও তার স্ত্রী আঁখ খাচ্ছিলেন। রাজা রামগুপ্ত সন্ন্যাসিকে দেখে তাকেও আঁখ খেতে দেন এবং আঁখ কাঁটার জন্য একটি ধারালো ছুরি দেন। এই সুযোগে কিছু বোঝার

আগেই বিক্রমাদিত্য রাজা রামগুপ্তকে ছুরি দিয়ে হত্যা করেন।[৫৫]

আরব বণিকরা বাংলা থেকে আঁখ তাদের দেশে নিয়ে না গেলেও মাটির হাঁড়িতে করে আঁখের গুড় নিয়ে যেতো। আঁখ পচঁনশীল না হলে হয়তো জাহাজ বোঝাই করে আঁখও আরবে নিয়ে যেতো।

ভারতবর্ষের হাতির দাঁত আরবদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং লাভজনক পণ্য ছিল। তারা এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে হাতির দাঁত আরবে নিয়ে যেতো, এর অন্যতম কারণ ভারতবর্ষে হাতির সমৃদ্ধি এবং আরবে হাতির অপর্যাপ্ততা। হজরত মোহাম্মদের (স) জন্মের পূর্বে ইয়েমেনের শাসনকর্তা আব্রাহা বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে রওনা দেয় মক্কার কাবা শরীফ ভেঙ্গে ফেলার জন্য। আল্লাহর আদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি তাদের উপর পাথর বর্ষণ করেছিল।[৫৬] আব্রাহাকে প্রতিহত করার জন্য কোন হাতি আরবদের ছিল না। অপরদিকে আব্রাহার এই অভিযানে ছিল আফ্রিকা থেকে সংগৃহীত মাত্র বারটি হাতি। ১৫ হিজরি পারস্য বিজয় অভিযানে কাদিসিয়ার যুদ্ধে পারস্য সেনাপতি রুস্তমের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার এবং হাতি ছিল মাত্র আটচল্লিশটি। অপরদিকে মুসলিম সেনাপতি সাদ বিন আবু ওয়াক্কাসের (রা) সৈন্য বাহিনীতে কোন হাতি ছিল না।[৫৭] ইসলামের প্রথম যুগের কোন যুদ্ধে আরবরা হাতি ব্যবহার করেছে এমন কোন তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না, তাছাড়া এই দুটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় যুদ্ধে বিপরীত পক্ষের হাতির সংখ্যাও ছিল খুবই নগণ্য।

প্রচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচুর হাতি পাওয়া যেতো। মহেঞ্জোদারো ও হড়প্পা সভ্যতার শিলালিপিতে পালিত হাতি পরিচালনার প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম বন্য হাতিকে বশ মানানো হয় এই ভারতবর্ষেই। হিমালয়ের পাদদেশে লৌহিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী এলাকার পালকাপ্য মুনি সর্বপ্রথম বন্য হাতিকে বশ করেন এবং এ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৫৮]

৩২৭ খ্রিষ্টপূর্বে গ্রীকবীর আলেকজান্ডার বিশাল সেনা বাহিনী সমেত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলে বিপাশা নদীর তীরে বাধাগ্রস্থ হন। তাকে প্রতিহত করার জন্য বিপাশা নদীর তীরে অপেক্ষমাণ ছিল গঙ্গাড়িডির নন্দ রাজার চার হাজার হাতি।[৫৯] এর থেকে মাত্র দুশটি হাতির যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয়েছিল।[৬০] গঙ্গাড়িডির নন্দ রাজ্যের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সাত শত হাতি সব সময় প্রস্তুত থাকতো যে কোন জরুরি পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য।[৬১] (অনেকে মনে করেন গঙ্গাড়িডির আসল নাম গঙ্গাহৃদি, এর অর্থ গঙ্গা

হৃদয়ে যার)

১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে কামরূপের রাজা পরীক্ষিত কুচবিহার আক্রমণ করে কিছু এলাকা দখল করে এবং রাজা রঘুনাথের পরিবারের সদস্যদের বন্দি করে রাখেন। রাজা রঘুনাথের অনুরোধে ইসলাম খাঁ রাজা রঘুনাথের পরিবারকে উদ্ধার এবং রাজা পরীক্ষিতকে উৎখাত করার জন্য মখরম খাঁ কে পাঠান। এই যুদ্ধাভিযানে মখরম খাঁর সৈন্য দলে তিনশত প্রশিক্ষিত হাতি ছিল।[৬২]

ভারতবর্ষের এই অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশেও প্রচুর পরিমাণে হাতি পাওয়া যেতো। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এই তিন এলাকা নিয়ে রামু রাজ্য নামে একটি প্রভাবশালী রাজ্য ছিল। আরব ভূগোলবিদগণ এর নাম দিয়েছিল জাজিরাতুল রামি। প্রখ্যাত আরব বণিক সুলাইমের মতে জাজিরাতুল রামির রাজা দেবপালের পঞ্চাশ হাজার হাতি ছিল।[৬৩] বর্তমানে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় যে হাতির পাল বিচরণ করতে দেখা যায় সম্ভবত সেগুলো রামুর রাজার পোষা হাতির বংশধর এবং সেগুলো বন্য হাতির মতো উগ্র স্বভাবের নয়। প্রাচীন বাংলায় হস্তি-আয়ুর্বেদ নামে বন্য হাতি ধরা এবং পালনের বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব হয়েছিল বলে প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়।[৬৪]

মুঘল সম্রাটদের হাতি বিলাসিতাও ছিল ইতিহাসে স্মরণ রাখার মতো। সম্রাট আকবরের পিলখানায় হাতির সংখ্যা ছিল অনেক, বড় হাতি ছিল বারো হাজার এবং মাদী হাতি ছিল বিশ হাজার। হাতিগুলোর খাবারের জন্য সে সময় ব্যয় হতো দৈনিক চার লক্ষ টাকা।[৬৫] সম্রাট আকবরের ছেলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের যোদ্ধা হাতি ছিল বারো হাজার এবং এই হাতিগুলোর খাবার পরিবহনের জন্য ছিল ছোট এক হাজার হাতি। এছাড়াও তাঁর এক লক্ষ হাতি ছিল, যা আমহারা অর্থাৎ শাহী মহিলাদের পরিবহণে ব্যবহৃত আচ্ছাদিত পালকি এবং শাহী মালপত্র পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা হতো। তাঁর পিলখানা ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ষিক ব্যয় হতো নূন্যতম চারশত ষাট লক্ষ আশরফি।[৬৬] সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রাতঃভ্রমণের জন্য ইন্দ্রগজ নামের বিরাটাকার একটি হাতি ছিল। এর পিঠে উঠতে চৌদ্দ ধাপের মই ব্যবহার করা হতো। দৈনিক চার মন চাল ও দুই মন মাংস এক মন তেল বা মাখনে রান্না করে একে খাওয়ানো হতো। এছাড়া দৈনিক এক মন দেশি মদ ছিল এর খাদ্যতালিকায়। ইন্দ্রগজের সাজসজ্জার জন্য ছিল চার মন স্বর্ণের অলঙ্কার এছাড়া রূপচর্চার জন্য রোজ চন্দনকাঠের গুড়ো দিয়ে এর শরীর মেজে দেয়া হতো।[৬৭]

হাতির পায়ের নিচে পিষে মৃত্যুদন্ড

গুরুতর অপরাধীদের হাতির পায়ের নিচে পিষে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রথা চালু ছিল মুঘলদের সময়। রাজা মানসিংহের চাচা ভগবান দাসের তিন পুত্র রামজী, বেচারাম ও শ্যামকে রাজ্যবিরোধী চক্রান্ত করায় হাতির পায়ের নিচে তাদের মাথা পিষে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল।[৬৮] বাংলার শাসকদের সামরিক বাহিনীতেও প্রধান অস্ত্র ছিল হাতি। সুলতানি আমলের শেষ সময় পর্যন্ত রণহাতির ব্যাপক ব্যবহার ছিল। সুলতান নাসির উদ্দিন শাহ প্রশিক্ষিত হাতি ছিল ৯১৪ টি। হাতিগুলো তাদের শুঁড় দিয়ে তলোয়ার ধরতে পারতো এবং পাথর নিক্ষেপ করতে পারতো।[৬৯]

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে প্রচুর পরিমাণে হাতি পাওয়া যেতো তা উল্লেখিত ঘটনাগুলো থেকে সহজেই অনুমেয়। ভারতবর্ষে হাতির দাঁতে কারুকাজ করা বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করে সংরক্ষণ করা হতো সৌখিন পণ্য হিসেবে। কথিত আছে রাজা বল্লাল সেনের হাতির দাঁত দিয়ে বানানো খাঁচা বিশিষ্ট একটি পালকি ছিল। তিনি তার শত্রুপক্ষের পরিবারের মেয়েদের বন্দী করে এই পাল্কিতে করে তুলে নিয়ে আসতেন।[৭০] ভারতবর্ষের বাহিরেও অভিজাত শ্রেণিতে হাতির দাঁতের তৈরি আসবাবপত্রের ব্যবহার ছিল। হজরত মোহাম্মদ (স) তাঁর দূত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা) মারফত আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশীর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। বাদশা নাজ্জাশী সেই পত্রটি হাতির দাঁতের তৈরি একটি বাক্সে সম্মানের সাথে সংরক্ষণ করেছিলেন।[৭১] পর্যাপ্ত হাতি থাকার কারণে ভারতবর্ষে হাতির দাঁত সহজলভ্য ছিল। তাই আরব বণিকরা ভারত থেকে হাতির দাঁত কিনে আরব, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং পারস্যে নিয়ে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করতো।

প্রাচীনকালে বাংলার স্থানীয় বাজারে কড়ি দিয়ে লেনদেন হলেও স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দী থেকেই বাংলায় মেশিনে ছাপ দেয়া মুদ্রা তামা ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়।[৭২] এছাড়া তখন বাংলায় অর্থের মানের একক ছিল কড়ি। বিশ কড়িতে এক কাকিনী (ভারতীয় তামার মুদ্রা), চার কাকীনিতে এক পণ, ষোল পণে এক দ্রক্ষ (ভারতীয় রৌপ্যমুদ্রা), ষোল দ্রক্ষে এক নিষ্ক (ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রা) এভাবেই তখন অর্থের হিসাব রাখা হতো।[৭৩] একই সময়ে গ্রীসে লোহার মুদ্রা, মালয় উপদ্বীপে টিনের মুদ্রা, চীনে পিতলের মুদ্রা এবং দক্ষিন ভারতে সীসার মুদ্রার প্রচলন ছিল।[৭৪] বাংলায় আন্তর্জাতিক লেনদেনগুলো হতো 'ক্যালটিস' নামের স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে।[৭৫] এছাড়া আরব বণিকরা বাংলায় এসে দিরহাম অর্থাৎ আরবীয় রৌপ্যমুদ্রা এবং দিনার অর্থাৎ আরবীয় স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কেনাকাটা করতো। সে সময় বাংলায় প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা

ভারতবর্ষে কি পরিমাণ স্বর্ণ ছিল তার বিবরণ

মজুদ ছিল। বাংলায় স্বর্ণের সমৃদ্ধি এতো বেশি ছিল যে কার কাছে কি পরিমাণ সোনার মজুদ আছে তা দিয়ে তার সামাজিক মর্যাদা এবং ধনাঢ্যতার নির্ধারণ করা হতো। ধনাঢ্যরা সোনার থালা-বাটিতে খাবার খেত। ষোড়শ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ শুধুমাত্র লুটেরাদের নিকট থেকে তেরশত সোনার থালা এবং প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করেছিলেন।[৭৬] এছাড়া পঞ্চম থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত জমির কেনাবেচা স্বর্ণমুদ্রায় হতো। ঐ সময়ের জমির দলিলে জমির দাম স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যায় লিখিত পাওয়া যায়।[৭৭]

ভারতবর্ষ স্বর্ণে কি পরিমাণ সমৃদ্ধ ছিল তা বোঝার জন্য সম্রাট আকবরের সময়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করাই যথেষ্ঠ। সম্রাট আকবর কিলিজ খানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন খাজাঞ্চীখানাগুলোয় রক্ষিত মোট স্বর্ণের পরিমাণ জানানোর জন্য। কিলিজ খান শুধুমাত্র আগ্রায় অবস্থিত খাজাঞ্চীখানায় রক্ষিত স্বর্ণের পরিমাপ করার জন্য বণিকদের কাছ থেকে আটশত দাড়িপাল্লা সংগ্রহ করেন। এক হাজার মানুষ পাঁচ মাস ধরে স্বর্ণ ওজন করার পরেও শেষ করা যায়নি। সম্রাটের নির্দেশে স্বর্ণ ওজন করার কাজ অসমাপ্ত রেখেই ফিরে যেতে হয়েছিল।[৭৮]

চর্যাপদের একটি কথা উল্লেখ আছে, "আপণা মাসেঁ হরিণা বৈরী" অর্থাৎ হরিণের শত্রু হরিণের নিজের মাংস। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই নীতি খুব ভালভাবেই কার্যকর হয়েছিল, ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ১৯০ বছর ভারতবর্ষের দুর্দশার কারণ ছিল এর প্রাচুর্য। ইউরোপীয়রা প্রথমে মসলার গন্ধে ভারতবর্ষে আসলেও এতো সমৃদ্ধি দেখে তারা আর ফিরে যায়নি। ভারতবর্ষের প্রথম সারির কিছু বিশ্বাসঘাতককে একত্রিত করে তাদের সহায়তায় নিজেদের অবস্থান পাকা পোক্ত করেছিল।

ইউরোপীয়দের প্রভাবে আরব বণিকরা একসময় ভারতবর্ষে তাদের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে এছাড়া ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের নামে বিভিন্ন সময় তারা নিরীহ আরব বণিকদের হত্যা করে তাঁদের জাহাজ পুঁড়িয়ে দেয়। আর এর সূত্রপাত করেছিল পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা; ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মে ভাস্কো ডা গামা তাঁর নৌবহর নিয়ে কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছে। তাদের আগমনের উদ্দেশ্য যে ভাল কিছু নয় এটা আরব বণিকরা ভালভাবেই বুঝতে পেয়েছিল। যার কারণে তাঁরা জামোরিনকে (কালিকটের রাজাদের উপাধি) পর্তুগিজদের বিষয়ে জানালে তিনিও তা আঁচ করতে পেয়ে তাদের আটকের নির্দেশ দেন; কিন্তু রাজ্যেরে প্রধান পুরোহিতের হস্তক্ষেপে ভাস্কো ডা গামা ঐ

ইউরোপীয়রা আরব বণিকদের সাথে অন্যায় আচরণ করত

পুরোহিতের হাত ও কান কেটে দেন

বছরের ২৯ আগষ্ট নিজের দেশ ফিরে যায়। কিন্তু যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নেয়।

ভাস্কো ডা গামা কালিকট ছেড়ে যাওয়ার দুই বছর পর ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর আরেক পর্তুগিজ নাবিক পেদ্রো আলভারেজ কাব্রাল কালিকটে এসে পৌঁছে এবং সেখানে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় কুঠি (বাণিজ্যিক দফতর) স্থাপন করেন। কুঠি স্থাপন করেই তিনি তার শক্তি প্রদর্শন করতে আরব বণিকদের একটি মাল বোঝাই জাহাজ বন্দর থেকে লুট করে নেয়; যার কারণে আরব বণিকরা কালিকটে পর্তুগিজদের কুঠি আক্রমণ করে কুঠির অধ্যক্ষ আয়বেস কোরীয়াকে হত্যা করে। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত আলভারেজ কাব্রাল তার জাহাজ থেকে টানা দুদিন কালিকট বন্দরের গোলাবর্ষণ করে নিজ দেশে ফিরে যান।[৭৯]

আলভারেজ কাব্রা দেশে ফিরে তার দেশের রাজাকে কালিকট বিজয়ের পরিকল্পনা জানান এবং পরিকল্পনা মোতাবেক ভারতের মসলার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামা আবারো কালিকটে আসেন। কালিকটে এসেই তিনি আরব বণিক ও মোপলাদের (কালিকটে বসবাসকারী মুসলিম) কালিকট থেকে বের করে দেয়ার দাবি করেন। কিন্তু জামোরিন এতে অস্বীকৃতি জানালে ভাস্কো ডা গামা জাহাজ থেকে সারাদিন গোলাবর্ষণ করে বন্দরের সাধ্যমতো ক্ষতি করেন এবং যাবার সময় আরব বণিকদের দুটি জাহাজ লুট করে নেয়।

জামোরিন যে কিছুই করেননি তা কিন্তু নয়। তিনি তাঁর রাজ্যের সেই প্রধান পুরোহিত কে পাঠান ভাস্কো ডা গামাকে থামানোর জন্য। ভাস্কো ডা গামা এবার সেই পুরোহিতকে তার প্রাপ্য পুরস্কার দিয়ে দেন। তিনি পুরোহিতের হাত ও কান কেটে চিঠি সমেত জামোরিনকে পাঠান, আর চিঠিতে জামোরিনকে অনুরোধ করেন সেগুলো রান্না করে খাওয়ার জন্য।[৮০]

এবার পর্তুগিজ নাবিক এ্যাফোনসো দ' আযালবুকার্ক কালিকট ধ্বংসের ব্রত নিয়ে ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি কালিকট বন্দরে পৌঁছান। বন্দরে নেমেই তার লোকজন লুটপাট শুরু করে। স্থানীয় জনগণ, আরব বণিক ও মোপালারা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং সেখান থেকে পর্তুগিজদের হটিয়ে দেন।[৮১]

১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক আযালবুকার্ক ১৮টি রণতরী নিয়ে কোচিন থেকে মালাক্কা বন্দরে এসে পৌঁছে। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম আরব বণিকদের হত্যা এবং মালাক্কা বন্দরের মসলার বাজারের একক নিয়ন্ত্রণ। পর্তুগিজরা একরকম

মানুষ বিক্রি করতে হতো অভাবের তাড়নায়

নোটিশ জারি করেই আরব বণিকদের জাহাজে গোলাবর্ষণ করে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রাণ বাঁচাতে যারা জলন্ত জাহাজ থেকে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছিল তাঁদেরকেও চরম উল্লাসে হত্যা করে। আর এদৃশ্য তাকিয়ে দেখা ছাড়া চীন এবং ভারতীয় বণিকদের কিছুই করার ছিল না। ঐ দিনটি ছিল প্রেট্রন সেন্ট জেমস উৎসবের দিন। আযালবুকার্ক তাঁর ধর্মীয় পবিত্র উৎসব উৎযাপন করেছিল নিরীহ আরব বণিকদের নির্মমভাবে হত্যা করে।[৮২]

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের প্রভাব বাড়ার সাথে সাথে কমতে থাকে বাংলার সমৃদ্ধি ও আরব বণিকদের আগমন। ব্রিটিশ শাসনামলের দুইশত বছরে বাংলার সমৃদ্ধি এতটাই কমে যে মানুষ অভাবের তাড়নায় নিজের স্ত্রী-সন্তানকে বিক্রয় অথবা আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৮০৭ সালে ময়মনসিংহ পরগনার সদারাম দাস মাত্র তের সিকিতে তার ছয় বছরের মেয়েকে বিক্রয় করেছিল এবং ১৮০৮ সালে আরেক জন ব্যক্তি স্বামী, স্ত্রী ও দুই ছেলে মাত্র সাড়ে তিন টাকার বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করেছিল। এই দুটি মানুষ বিক্রয়ের দলিল কালের সাক্ষী হয়ে আজও বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[৮৩]

একসময় ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করে এবং ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পণ্য এবং সম্পদ রপ্তানির নামে লুটপাট করে তাদের দেশে নিয়ে যায়। মূলত তাদের কারণেই সমাপ্তি ঘটে বাংলার সমৃদ্ধির এবং এদেশে আরব বণিকদের নৌবাণিজ্যের।

তথ্যসূত্র-

(১) এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার, প্রাক ইসলামি আরবদের ইতিহাস, ২০২২, পৃ. ১৭১
(২) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩
(৩) সৈয়দ সুলেমান নাদভী (র), আরবের নৌবহর, কোলকাতা, ১৯৩১, পৃ. ৭৯
(৪) আল কোরআন, সুরা সাফফাত ৩৭, আয়াত ৮৮
(৫) আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাসির আদ দামেশকী (র), তাফসিরে ইবনে কাসির, ইরাক, ১৬শ খন্ড, পৃ. ২০৫
(৬) এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
(৭) সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, কোলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১১৭
(৮) (ক) সৈয়দ সুলেমান নাদভী (র), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১
(খ) মওলানা আকরাম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ২০০২, পৃ. ৮৩
(গ) 1001 Inventions: The Enduring Legancy of Muslim Civilization-Prof. Salim T.S. Al Hasani, অনুবাদ-মুসলিম সভ্যতার ১০০১ আবিষ্কার, মিরাজ রহমান ও মো. আবুল বাশার, পৃ. ২৮৫
(৯) আল কোরআন, সুরা কোরাইশ ১০৬, আয়াত ১-৩
(১০) এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১
(১১) (ক) আবু ফিদ হাফিজ ইবন কাসীর (র), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খন্ড, পৃ. ৪১৪
(খ) মওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, ২০০৩, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৪
(১২) (ক) সৈয়দ সুলেমান নাদভী (র), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
(খ) মওলানা আকরাম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
(১৩) আল কোরআন, সুরা হুদ ১১, আয়াত ৩৭
(১৪) আল কোরআন, সুরা জাসিয়া ৪৫, আয়াত ১২
(১৫) আল কোরআন, সুরা আর রহমান ৫৫, আয়াত ১৯-২৪
(১৬) আল কোরআন, সুরা ফাতির ৩৫, আয়াত ১২
(১৭) আল কোরআন, সুরা আন-নহল ১৬, আয়াত ১৪
(১৮) আল কোরআন, সুরা রুম ৩০, আয়াত-৪৬
(১৯) (ক) সৈয়দ সুলেমান নাদভী (র), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
(খ) মওলানা আকরাম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

(২০) বোখারী শরীফ, হাদিস নম্বর ২৯২৪
(২১) শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, হাদিস শরীফ বাংলা মর্মবাণী, ২০২১, হাদিস নম্বর ৯৬৭
(২২) প্রিন্স মুহাম্মদ সজল, সানজাক-ই উসমান, ২০১৮, পৃ. ৩২০
(২৩) সৈয়দ সুলেমান নাদভী (র), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
(২৪) (ক) ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, ২০০3 , পৃ. ২৬
(খ) এ. কে. এস. আবদুল আলীম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, ১৯৬৯, পৃ. ১২
(২৫) এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮
(২৬) বোখারী শরীফ, হাদিস নম্বর ২৬৪৬-২৬৪৯
(২৭) বেদপ্রকাশ উপাধান, কল্কি অবতার আউর মুহাম্মদ সাহাব, পৃ. ২৯
(২৮) ড. অতুল সুর, বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন, কোলকাতা, পৃ. ১০
(২৯) সৈয়দ সুলেমান নাদভী (র), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪-৪৬
(৩০) সুনীতিভূষণ কানুনগো, চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস, ২০১৮, পৃ. ১৪
(৩১) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
(৩২) আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ১৯৮০, পৃ. ৬২
(৩৩) সুনীতিভূষণ কানুনগো, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
(৩৪) সুনীতিভূষণ কনুনগো, বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, পৃ. ৪৬
(৩৫) ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২০১৭, পৃ. ২১
(৩৬) আহসানুল হক, চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ২০১৪, পৃ. ১০৪
(৩৭) সুনীতিভূষণ কানুনগো, প্রাচীন হরিকেল রাজ্য ও মধ্য চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত, ২০১৬, পৃ. ২১-২৬
(৩৮) প্রিন্স মুহাম্মদ সজল, পূর্বোক্ত,পৃ. ৩১৮
(৩৯) ড. অতুল সুর, কোলকাতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮
(৪০) সত্যেন সেন, মসলার যুদ্ধ, ১৯৬৮, পৃ. ৯৮
(৪১) পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
(৪২) আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬
(৪৩) বোখারী শরীফ, হাদিস নম্বর ৫৩০৪
(৪৪) ড. আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, ১৯৭০, পৃ. ০৪
(৪৫) আবুল ফজল আল্লামী, আইন-ই-আকবরী, পৃ. ৬১

(৪৬) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, ঢাকার ইতিহাস, কোলকাতা, ১৯১০, পৃ. ৬২৫
(৪৭) রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, কোলকাতা, ১৯৪০, পৃ. ১৫
(৪৮) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৫
(৪৯) পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৬
(৫০) ড. অতুল সুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১
(৫১) রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
(৫২) রিচার্ড এম. ইটন, ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯০, পৃ. ২২২
(৫৩) ড. অতুল সুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
(৫৪) গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ২৬
(৫৫) শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন, বাঙলার ইতিহাস, কোলকাতা, ১৯৪৯, পৃ. ৯৮
(৫৬) আবু ফিদ হাফিজ ইবন কাসীর (র),তাফসিরে ইবনে কাসির, পূর্বোক্ত, ১৮শ খন্ড, পৃ. ২৭৬-২৭৮
(৫৭) মওলানা ইসমাইল রেহান, মুসলিম উম্মার ইতিহাস, ১৯৯০, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৫৮
(৫৮) ড. অতুল সুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
(৫৯) (ক) ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, বংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৭৭, পৃ. ৪২
(খ) এ কে এম শাহনাওয়াজ, মানচিত্রে বাংলার ইতিহাস, ২০১১, পৃ. ২৮
(গ) গবেষণা বিভাগ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭, ১৭৮
(৬০) প্রফেসর মোহাম্মদ নূরনবী, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস, ২০১৪, পৃ. ৭৪
(৬১) শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
(৬২) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪১
(৬৩) (ক) এ. কে. এম. নাজির আহমদ, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, ১৯৯৯, পৃ. ২২
(খ) আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
(গ) গবেষণা বিভাগ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮
(৬৪) নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, কোলকাতা, ১৩৫৩ সন, পৃ. ৪৫৫
(৬৫) সম্রাট জাহাঙ্গীর, দোয়াজদা-সালা-জাহাঙ্গিরী, ১৮২৯, পৃ. ৪৬
(৬৬) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

(৬৭) পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
(৬৮) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
(৬৯) রিচার্ড এম. ইটন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০
(৭০) নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬
(৭১) শাইখ মুহাম্মদ ইসমাইল পানিপথী, ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, লাহোর, ১৯৬১, পৃ. ২৫৭
(৭২) কোকা আন্তোনভা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, কোলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩২৮
(৭৩) ড. অতুল সুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
(৭৪) শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৪
(৭৫) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
(৭৬) ড. অতুল সুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬
(৭৭) নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯
(৭৮) সম্রাট জাহাঙ্গীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
(৭৯) সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, কোলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১১৯
(৮০) পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
(৮১) পূর্বোক্ত
(৮২) সত্যেন সেন, পূর্বোক্ত পৃ. ৬৭
(৮৩) প্রত্যক্ষ দর্শনে বর্ণিত



সাহাবীদের দেশত্যাগী জীবন এবং ভারতবর্ষে তাঁদের ধর্মপ্রচার

প্রথম নবী হজরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ (স) পর্যন্ত যতো নবী রসুল পৃথিবীতে এসেছেন তাঁদের আগমন কালের মধ্যে শত শত বছরের ব্যবধান থাকলেও তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহর একাত্ববাদের মূলনীতির প্রচার করেছেন। এছাড়া ভারতবর্ষে শ্রী কৃষ্ণ, শ্রী রামচন্দ্র, গৌতম বুদ্ধ; ইরানে জরথুস্ত্র; চীনে কনফুসিয়াস; গ্রীসে হজরত লোকমান (আ); মিসরে হজরত ইউসুফ (আ); সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে হজরত লুত (আ) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের হলেও তাঁদের প্রত্যেকের শিক্ষায় একত্ববাদের অভিন্ন শিক্ষা বিদ্যমান ছিল।[1]

স্থান এবং কালের পার্থক্য যাই হোক না কেন মহামানবরা ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় মানুষদের অভিন্ন একত্ববাদ ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দিতেন; কিন্তু সত্য প্রচারের কাজ কোন কালেই সহজ ছিল না। তাঁদের প্রায় সবাই একত্ববাদ ও শিষ্টাচারের বাণী প্রচার করতে গিয়ে নিজ সম্প্রদায় বা কাছের মানুষ দ্বারা সবচেয়ে বেশি বাধাপ্রাপ্ত এবং নির্যাতীত হয়েছেন। সত্যের বাণী প্রচার করতে গিয়ে জীবন দিতে হয়েছে এমন মহামানবের সংখ্যাও কম নয়।

শেষ নবী হজরত মোহাম্মদের (স) ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ছিল না; আল্লাহর একত্ববাদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে তিনিও তাঁর সম্প্রদায় এবং খুব কাছের আত্মীয় স্বজন দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। হজরত মোহম্মদ (স) নতুন ধর্মমত প্রচার শুরু করলে মক্কার ধর্ম ব্যবসায়ীরা সবার আগে নড়েচড়ে বসে। এই নতুন ধর্ম তাদের বাপ-দাদাদের পালিত ধর্মের বিপরীতমুখী হওয়ায় তারা এটিকে সহজে মেনে নেয়নি। প্রথমে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলেও একপর্যায়ে এসে তারা কঠোর এবং উগ্রনীতি অবলম্বন শুরু করে; যার কারণে ধর্ম প্রচারের জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় নবুয়্যতের তের তম বর্ষে অর্থাৎ ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইয়াসরিব গমন করেন। ইয়াসবিরে গিয়ে তিনি এর নাম বদলে রাখেন মদিনা। ধর্মের জন্য দূর দূরান্তের পথ পাড়ি দেয়া ইসলাম প্রচারের বহু আগে থেকেই আরবদের মধ্যে ছিল। রসুলের (স) জন্মের আগে থেকেই মক্কার কাবা ঘর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে অনেক দূর থেকে লোকজন হাজির হতো। কিন্তু রসুলের (স) মক্কা থেকে মদিনা গমন তাদের মতো ছিল না। তিনি তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করেই মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

রসুল (স) প্রচারিত এক ঈশ্বরবাদের নতুন ধর্ম গ্রহণ কারণে প্রথম যুগের সাহাবীদের অত্যন্ত কষ্টকর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। নির্যাতনের চরম পর্যায়ে এসে রসুলের (স) নির্দেশে নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে অর্থাৎ ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম দলে দশ জন পুরুষ এবং চার জন মহিলা জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে লোহিত সাগরের

প্রাচীন সাঙ্গবা বা জেদ্দা বন্দরে যান।[২] এই দলের নেতৃত্ব দেন বনূ উমাইয়া গোত্রের উসমান ইবনে আফফান (রা)। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন আবিসিনিয়া যাওয়ার জন্য দুটি বণিক জাহাজ যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাঁরা সেই জাহাজে করে আবিসিনিয়া হিজরত করেন। সাহাবীরা হলেন-

(১) রসুলের (স) জামাতা বনূ উমাইয়া গোত্রের উসমান ইবনে আফফান (রা) এবং তাঁর স্ত্রী রসুলের (স) কন্যা রুকাইয়া বিনতে মোহাম্মদ (রা)। হজরত ইব্রাহীম (আ) ও লূতের (আ) পর উসমান ইবনে আফফান (রা) প্রথম ব্যক্তি যিনি সস্ত্রীক আল্লাহর জন্য হিজরত করেছিলেন।[৩]

(২) ইসলামের শত্রু উতবা বিন রাবিয়ার পুত্র বনূ আবদে শামস গোত্রের আবূ হুজাইফা ইবনে উতবা (রা) এবং তাঁর স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহায়ল (রা)। আবিসিনিয়া যাওয়ার পর তাঁদের একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের পুত্রের নাম রেখেছিলেন মোহাম্মদ।

(৩) হজরত আবূ বক্কর (রা) এর জামাতা বনূ আসাদ গোত্রের জুবাইর ইবনে আউয়াম (রা),

(৪) মক্কার সেরা ধনী এবং আমির পুত্র বনূ আবদুদা গোত্রের মুসাব ইবনে উমাইর (রা),

(৫) জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া বনূ জোহুরা গোত্রের আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা),

(৬) রসুলের (স) ফুফাতো ভাই বনূ মাখযূম গোত্রের আবূ সালামা ইবনে আবদুল আসাদ (রা) এবং তার স্ত্রী উম্মে সালামা বিনতে আবূ উমাইয়্যা (রা),

(৭) অত্যান্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ বনূ জুমাহ গোত্রের আবুস সায়িব উসমান ইবনে মাযউন (রা),

(৮) উচ্চ মর্যাদার সাহাবী বনূ আদী গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন আমির ইবনে রাবিয়া (রা) এবং তাঁর স্ত্রী লায়লা বিনতে আবূ হাসামা (রা),

(৯) বনূ আমির গোত্রের আবূ সাবারা (রা)। অনেকের মতে বনূ আমির গোত্রের আবিসিনিয়া প্রথম হিজরতকারী আবূ সাবারা (রা) নন বরং আবূ হাতিম (রা)।

(১০) কোমল হৃদয়ের ধার্মিক বনূ হারিস গোত্রের- সুহায়ল ইবনে বায়যা (রা)[৪]

দ্বিতীয় দফায় প্রায় ত্রিশজন মুসলমান আবিসিনিয়া হিজরত করেন এদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবার সমেত হিজরত করেছিলেন। উল্লেখ্য, হিজরতকারীদের সাথে যাওয়া তাঁদের স্ত্রী, সন্তান এবং আবিসিনিয়া জন্ম গ্রহণকারী শিশুরা এই ত্রিশের অন্তর্ভূক্ত নয়, তাঁদের হিসেব করলে সংখ্যা সত্তরজনের বেশি হবে। আবিসিনিয়ার

-স্ত্রী-সন্তান ছাড়াই হিজরত করেন
-আবু সালমা (রা:)

বাদশাহ নাজ্জাশী হিজরতকারীদের সবাইকে সাদরে গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়া হিজরতকারী কাফেলার দলে জাহেলি যুগের প্রখ্যাত কবি আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ছিলেন। হিজরত করার পর তিনি আবিসিনিয়ায় রচিত কবিতায় লিখেছেন-

"আমরা আল্লাহর জমিন এত প্রশস্ত পেয়েছি যে, তা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান থেকে নিষ্কৃতি দেয়।"[৫] তিনি আরেকটি কবিতায় লিখেছেন-

"ভ্রষ্টা নারীদের সন্তানের পরিবর্তে আমাকে এমন কিছু সংখ্যক নওজোয়ান দেয়া হয়েছে- যারা দানশীল এবং অসহায় বিধবাদের আশ্রয়স্থল।"[৬]

জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্যদেশে হিজরত করা সাহাবীদের কাছে কখনই সুখকর ছিল না; কিন্তু তাঁরা পরিবার-পরিজন সম্পদ-সম্পত্তি সবকিছুই ছেড়ে দেশত্যাগ করেছিলেন শুধুমাত্র ধর্ম পালন এবং প্রচারের জন্য। হিজরতকারী অন্য সাহাবীদের মতো আবূ সালামার (রা) হিজরতের ঘটনাও ছিল বেদনাবহুল। তিনি যখন স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলেন তখন তাঁর শশুরবাড়ির লোকজন তাঁদের ঘিরে ধরে এবং তাঁদের গোত্রের মেয়ে এই দাবিতে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামাকে (রা) জোর করে নিয়ে যায়। এরপর আবূ সালামার (রা) গোত্রের লোকজন এসে এবং তাঁদের গোত্রের সন্তান এই দাবিতে আবূ সালামার (রা) ছেলেকে নিয়ে যান। অসহায় আবূ সালামা (রা) স্ত্রী-সন্তান ছাড়াই হিজরত করতে বাধ্য হন।[৭]

মক্কার সবচেয়ে প্রাচুর্যবান পরিবারের সন্তান মুসাআব বিন উমাইর (রা) ইসলাম গ্রহনের পূর্বে বিলাসী জীবন যাপন করতেন। ইয়েমেনী জুতা এবং পারস্যের সেরা সুগন্ধি ব্যবহারে অভ্যস্ত মুসাআব বিন উমাইর (রা) পরিবার থেকে ত্যাজ্য হয়ে যখন মদিনায় পৌঁছলেন তখন তাঁর পরনে ছিল ১২ তালি দেয়া ছেঁড়া মলিন জুব্বা। সাহাবীরা হিজরতকালে কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা উপলব্ধি করার জন্য এই দুটি ঘটনাই যথেষ্ঠ।

ইসলামের প্রথম দিকে অন্যান্য গোত্রের মতো মক্কার বনূ জোহুরা ইবনে কিলাব গোত্র থেকে মোট ছয় জন পুরুষ ও এক জন মহিলা আবিসিনিয়া হিজরত করেছিলেন। তাঁরা হলেন-

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), মুত্তালিব ইবনে আযহার ও তাঁর স্ত্রী রামলা বিনতে আবূ আওফ (রা), আমির ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা), আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা) ও তাঁর ভাই।[৮]

এঁদের মধ্যে আমির ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী কাদেসিয়ার ঈগল খ্যাত সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) বড় ভাই এবং হজরত আমির

মুয়াবিয়ার (রা) ভাগ্নে। তিনি হজরত ওমরের (রা) খিলাফতে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন।[৯]

আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব (রা) ছিলেন সাদ বিন আবু ওয়াক্কাসের (রা) বাবা, যিনি এই বাংলাদেশে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। কিন্তু বাবা এবং ছেলের নামের বিভ্রাটে বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাসে একটি বড় অংশেই বাংলাদেশে আগত প্রথম সাহাবীর নাম সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা) কখনও বাংলাদেশে আসেননি, এসেছিলেন তাঁর বাবা আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব (রা)।

আবিসিনিয়ায় আগত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব (রা) ছাড়া বনূ জোহুরা ইবনে কিলাব গোত্রে সবাই আবিসিনিয়া থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে যারা আবিসিনিয়া হিজরত করেছিলেন হজরত জাফর ইবনে আবু তালিবের (রা) নেতৃত্বে তাঁরা ৭ম হিজরিতে মদিনায় আসেন। এই সময়ের মধ্যে আবিসিনিয়ার বেশ কয়েকজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এমন কি বাদশাহ নাজ্জাশী নিজেও জাফর ইবনে আবু তালিবের (রা) হাতে হাত রেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনিই দুটি জাহাজে করে সাহাবীদের মদিনা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। জাহাজ দুটি আবিসিনিয়ার ওকবা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে লোহিত সাগর পারি দিয়ে আরবের জার বন্দরে পৌঁছায়। জার বন্দর থেকে এক দিনের দূরত্ব পথ পার হয়ে সাহাবীদের কাফেলা মদিনায় এসে পৌঁছায়।[১০] মদিনায় ফেরত আসার সময় মক্কা থেকে হিজরতকারীদের সাথে ছিলেন রসুলের (স) সহধর্মিনী হাবিবা (রা) এবং নব্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী কয়েকজন আবিসিনিয়ার নাগরিক। ৩৪ জনের এই দল মদিনায় আসলে রসুল (স) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সবাইকে খয়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের অংশ উপহার প্রদান করেন।[১১]

আকাবার দ্বিতীয় বায়াতের পর রসুল (স) সাহবিদের আবিসিনিয়ার পরিবর্তে মদিনায় হিজরতের অনুমতি দেন।[১২] কারণ আকাবার দ্বিতীয় বায়াতে মদিনার ৭২ জন মক্কায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন; যার কারণে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবীদের নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই তিনি অনুমতি প্রদান করেন। রসুল (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর মক্কার সাহাবীদের মধ্যে হিজরতের আকাঙ্খা জোরালো হয়। তাঁরা সময় সুযোগ বুঝে নিজ দেশ ত্যাগ করতে থাকেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন এবং ধর্ম প্রচার।

ঘুমন্ত অবস্থায় সাহাবীদের উপর আক্রমণ

মদিনাতে পৌঁছে রসুল (স) শুরুতে স্থানীয়দের মধ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করলেও আশেপাশের গোত্রগুলোতে নতুন ধর্মের কথা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায়। যার কারণে সত্যসন্ধানী কিছু মানুষ নিজ থেকেই এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সবার কাছেই যেন এই ধর্মের বাণী পৌঁছায় এজন্য রসুল (স) মদিনার আশেপাশের গোত্রগুলোতে সাহাবীদের ছোট ছোট দল প্রেরণ করেন। গোত্রর সবাই যে সাহাবীদের সাদরে গ্রহণ করেছিল তা কিন্তু নয়, কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন আবার কেউ করেছিলেন রক্তপাত।

৬ষ্ঠ হিজরিতে রসুলের (স) নির্দেশে মোহাম্মদ বিন মুসলিমার (রা) নেতৃত্বে দশ জনের একটি দল বনূ সা'লাবার গোত্রের দিকে ধর্ম প্রচার করতে গেলে তারা রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত সাহাবীদের উপর হামলা চালায় ও সাহাবীদের এই দলের নয় জনকেই হত্যা করে এবং সংজ্ঞাহীন মোহাম্মদ বিন মুসলিমাকে (রা) মৃত মনে করে ফেলে রেখে যায়। গুরুতর আহত মোহাম্মদ বিন মুসলিমার (রা) সজ্ঞা ফিরে এলে তিনি ঐ এলাকা ত্যাগ করে প্রাণে বেঁচে যান।

৭ম হিজরিতে ইবনে আবূ লওজা আস সালামী (রা) পঞ্চাশ জন সাহাবী নিয়ে বনূ সালীম গোত্রে ইসলাম প্রচারের জন্য গেলে সেখানে তাঁরা আক্রমণের স্বীকার হন। বনূ সালীম গোত্রের লোকেরা দল বেঁধে আক্রমণ চালালে ইবনে আবূ লওজা আস সালামী (রা) কোন রকম আত্মরক্ষা করে তাঁর দল নিয়ে ফিরে আসেন।

৮ম হিজরিতে আমর বিন কা'ব আনসারী (রা) পনের জন সাহাবী নিয়ে বনূ কোযা'আর আতলা গ্রামে ধর্মের বাণী নিয়ে গেলে বনূ কোযা'আর লোকেরা তাঁদের আক্রমণ করে। সাহাবীরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও তাঁদের হাত থেকে বাঁচতে পারেননি, তাদের আক্রমণে সবাই শহীদ হন, কেবল আমর বিন কা'ব আনসারী (রা) গুরুতর আহত অবস্থায় বেঁচে গিয়েছিলেন।

সাহাবীরা ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে সব জায়গায় আক্রমণের স্বীকার হয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। অনেক স্থানে স্থানীয়রা তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়েছিলেন। আশারা মুবাশশারা অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় বেহেশতের সুসংবাদ পাওয়া ব্যক্তিদের একজন আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) ৬ষ্ঠ হিজরিতে বনূ কা'ব গোত্রে ইসলামের বাণী নিয়ে গেলে গোত্রপ্রধান আসবাগ বিন আমর কালবী (রা) তাঁর গোত্রের অধিকাংশ লোক নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর কন্যা তামাযা বিনতে আসবাগকে (রা) আবদুর রহমান বিন আউফের (রা) সাথে বিয়ে দেন।[১৩]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নির্মম নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য রসুলের (স) নির্দেশে মক্কা থেকে শুধুমাত্র আবিসিনিয়া এরপর মদিনায় হিজরত করলেও পরবর্তিতে তাঁরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরেন। সাহাবীদের জীবনে দেশত্যাগের পরিমাণ এতোটাই ছিল যে ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জন্মভূমি থেকে দূরে হিজরতের স্থানে।[১৪] ধর্মপ্রচার করার জন্য দেশত্যাগ করে বিভিন্ন দেশে হিজরত করতে সাহাবীরা তাঁদের অন্তরের গভীর থেকে তাগিদ অনুভব করতেন, আর তাঁরা এই তাগিদ পেতেন রসুলের (স) জীবনাদর্শ এবং বিভিন্ন সময় নাজিল হওয়া কোরআনের কিছু আয়াত থেকে। পবিত্র কোরআনে হিজরত নিয়ে উল্লেখ আছে-

"আর যারা সত্য বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছে, তাঁরা সঙ্গতভাবেই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করতে পারে। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।"[১৫]

"তাই যারা হিজরত করেছ, ঘরছাড়া হয়েছ, আল্লাহর পথে নির্যাতিত হয়েছ, যুদ্ধ করেছে বা নিহত হয়েছে, তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেব। তারা প্রবেশ করে জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা। এ আল্লাহর পুরস্কার। বস্তুত আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।"[১৬]

"আর যে-কেউ অন্যায়ের রাজত্ব ছেড়ে আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে। আল্লাহ ও রসূলের পথে হিজরত করার সময় পথে কারো মৃত্যু হলে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে অবধারিত। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালু।"[১৭]

"যারা বিশ্বাস করেছে, যারা হিজরত করেছে, যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, তারাই প্রতিপালকের কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তারাই সফলকাম।"[১৮]

"যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছে এবং যারা বিশ্বাসীদের আশ্রয় দিয়েছে, তারাই সত্যিকারের বিশ্বাসী। তাদের জন্য রয়েছে প্রতিপালকের ক্ষমা ও উত্তম জীবনোপকরণ।"[১৯]

"যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে ও পরে নিহত হয়েছে বা মারা গেছে- আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাদের জন্য উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন। আল্লাহই উত্তম রিজিকদাতা।"[২০]

"যারা (বিশ্বাস স্থাপনের কারণে) নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছে, বিপদ মোকাবেলায় ধৈর্য্যের সাথে লেগে থেকেছে, তোমার প্রতিপালক তাদের অবশ্যই ক্ষমা করবেন, পরমদয়া করবেন।"[২১]

ধর্মের জন্য দেশত্যাগী সাহাবীরা শুধুমাত্র মক্কা থেকে হিজরত করেই থেমে থাকেননি, তাঁরা ধর্মের সত্যবাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য ইউরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন ও মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে যেখানেই মানুষের বসতি আছে বলে জানতেন সেখানেই গিয়েছেন।

বিভিন্ন দেশে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সবার আগে সাহাবীদের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ার কথা; কিন্তু সাহাবীরা এই প্রতিবন্ধকতাকে খুব সহজেই জয় করেছিলেন তাঁদের অসাধারন মেধাশক্তির কারণে। আরবি ভাষাকে প্রাচীনকাল থেকেই বলা হতো পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। আরবি ভাষায় জাহাজের প্রতিশব্দ পঞ্চাশটিরও বেশি, আর বাতাসের প্রতিশব্দ প্রায় একশতটি এবং গতি প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বাতাসের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে,[২২] এ থেকে ধারণা পাওয়া যায় আরবি ভাষার শব্দ ভান্ডার কতটা সমৃদ্ধ। আরবরা মেধাশক্তির কারণে এই শব্দ ভান্ডার সহজেই রপ্ত করতো যার কারণে তারা অনেক আগে থেকেই ভাষা শিক্ষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিল। রসুলের (স) কাছে বিভিন্ন ইহুদী গোত্রপতিরা চিঠিপত্র প্রদান করলে তিনি তা মদিনার ইহুদিদের নিকট থেকে পড়ে নিতেন; কিন্তু রসুল (স) তাদের নিকট থেকে চিঠি পড়ে নেয়ার ক্ষেত্রে একসময় সংশয় প্রকাশ করেন। যার কারণে রসুলের (স) নির্দেশে যায়েদ বিন সাবিত (রা) মাত্র পনের দিনে তাদের সুরাইনী ভাষা শেখেন। প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের (রা) একশত গোলাম ছিল এবং তাঁরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলতো। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) তাঁদের প্রত্যেকের সাথে তাঁদের ভাষায় কথা বলতেন।[২৩] তাই অনুমান করা যায় সাহাবীদের শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ

থাকায় যেখানেই যেতেন খুব সহজেই সেখানকার ভাষা শিখে নিতেন।

ইসলামর প্রচারের জন্য সর্বোচ্চ সংখ্যক সাহাবী এক সাথে হিজরত করেছিলেন বিদায় হজের দিনে। বিদায় হজের শেষ দিন লক্ষাধিক সাহাবীর উপস্থিতিতে রসুল (স) বলেন,- "হে মানুষ! তোমরা যারা এখানে হাজির আছ, আমার বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিও। যার কাছে বাণী পৌঁছাবে, হতে পারে সে তোমার চেয়েও এ বাণীর উওম সংরক্ষক ও প্রচারক।"[২৪] রসুলের (স) বিদায় হজের ভাষণের পর উপস্থিত সাহাবীদের একটি বড় অংশ সত্যবাণী প্রচারের জন্য তাৎক্ষনিক বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। এই দেশত্যাগী সাহাবীদের মাধ্যমেই ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায় ইসলামের বাণী। সাহাবীদের ধর্ম প্রচার অভিযান মূলত শুরু হয়েছিল নবুয়্যতের ৫ম বর্ষেই। নবুয়্যতের পঞ্চম বর্ষ থেকে শুরু করে সাহাবা যুগের শেষ পর্যন্ত সাহাবীরা জন্মভূমি ত্যাগ করে ধর্মপ্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে হিজরত করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় সাহাবীরা ভারতবর্ষে এসেছেন। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে আরবের বাহিরের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের গতি ছিল বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় এছাড়া ইউরোপ এবং পারস্যের আগেই ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রচার হয়েছিল। রসুল (স) নতুন ধর্মমত প্রচার করার সাথে সাথে যখন মক্কার প্রভাবশালীরা তাঁর বিপক্ষে দাঁড়ায়, এসময় নব্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী সাহাবীরা মক্কা ত্যাগ করে শুধুমাত্র আবিসিনিয়া পরবর্তীতে মদিনায় হিজরত করেন। কারণ এই দুই স্থানই তাঁদের জন্য নিরাপদ ছিল। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশি নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে হিজরতকারী প্রথম কাফেলা থেকে শুরু করে সবাইকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন এবং আকাবার দ্বিতীয় বায়াতের পর মাদিনাবাসীরাও হিজরতকারীদের নিরাপত্তা দিতে থাকে। এই দুই স্থান থেকে নিরাপদে ধর্ম প্রচার করার জন্য ভৌগলিক কারণে ভারতবর্ষে যাওয়ার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং ভারতবর্ষ ছিল মক্কার প্রভাবশালীদের আওতার বাহিরে। অন্যদিকে পারস্য এবং ইউরোপের দেশগুলোতে সাহাবীদের নিরাপত্তা দেয়ার মতো কেউ ছিল না এবং মক্কার প্রভাবশালীদের সাথে তাদের বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্ক থাকায় প্রাথমিক যুগে সেখানে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য সাহাবীদের যাওয়া সম্ভব হয়নি। মক্কা বিজয়ের পর ইউরোপ এবং পারস্যে ধর্ম প্রচারে গতি পায় এবং একের পর এক বিজয় অভিযান চলতে থাকে। ততো দিনে ভারতবর্ষে ধর্ম প্রচারের জন্য সাহাবীদের বেশ কয়েকটি দল সেখানে ছড়িয়ে পরে এবং অনেক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষে আরব বণিকরা অনেক আগে থেকেই যাতায়াত করায় এখানকার মানুষ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা আগে থেকেই ছিল। আরব বণিকরা বাণিজ্যের সুবিধার্থে ভারতবর্ষে বিভিন্ন বন্দরে এমনকি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন ও স্থানীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, যার কারণে ভারতবর্ষের কিছু কিছু স্থানে বণিক সাহাবীরা ইসলামের প্রথম প্রাচারণা বেশ সতঃফূর্তভাবে করেছিলেন এবং তাঁরা অসংখ্য তাবেঈ রেখে গেছেন।

বাণিজ্য ছাড়াও ভারতবর্ষের প্রতি সাহাবীদের আগ্রহের আরো বেশ কিছু কারণ ছিল। প্রথমত, প্রথম সভ্য মানুষ ও নবী হজরত আদম (আ) আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে শ্রীলঙ্কার 'নূয়' পাহাড়ে অবরতণ করেন এবং এই শ্রীলঙ্কা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। এছাড়া হজরত জিব্রাইল (আ) সর্বপ্রথম পৃথিবীতে অবতরণ এই ভারতেই করেছিলেন। হজরত আদমের (আ) ছেলে পৃথিবীর দ্বিতীয় নবী হজরত শীষ (আ) তার জীবদ্দশায় বেশ কিছু দিন ভারতবর্ষে ছিলেন এবং ভারতের অযোদ্ধায় তাঁর রূপক মাজার এখনও বিদ্যমান। রসুল (স) ভারতবর্ষের চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে আস্থাশীল ছিলেন এবং হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি ভারতের একজন চিকিৎসকের চিকিৎসা নিয়েছিলেন।[২৫]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে ভারতবর্ষের বেহেস্তের নদী। ফাতহুল কাদীর তাফসীরে পাঁচটি নদীকে জান্নাতের নদী বলা হয়েছে। এর মধ্যে সিহুন যা ভারতবর্ষে, জিহুন বা বালাখ নদী সিরিয়ায়, দজলা এবং ফোরাত ইরাকে এবং নীল নদ যা মিশরে প্রবাহিত হয়েছে।[২৬]

সম্ভবত এই সিহুন নদীই ভারতের গঙ্গা নদী; কারণ প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে আসছেন গঙ্গার উৎস স্বর্গে। রামায়নে পাওয়া যায়- "ব্রহ্মা চলে গেলে ভগীরথ অঙ্গুষ্ঠাগ্রে ধরাতলে ভর দিয়ে এক বৎসরকাল কঠোর তপস্যা করলেন, তাতে পশুপতি প্রীত হয়ে গঙ্গাকে মস্তকে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। তখন গঙ্গা বিশাল আকার ধারণ করে আকাশ থেকে দুঃসহ বেগে শিবের মস্তকে পড়তে লাগল। গঙ্গার ইচ্ছে হল তিনি স্রোতের বেগে শংকরকে পাতালে নিয়ে যাবেন। তাঁর এই গর্ব হয়েছে জেনে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে জটামন্ডলমধ্যে তাঁকে অবরুদ্ধ করলেন। তখন ভগীরথ আবার তপস্যা করলেন, তাতে তুষ্ট হয়ে মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দুসরোবরের দিকে পরিত্যাগ করলেন। গঙ্গা সপ্ত স্রোতে বইতে লাগলেন- পশ্চিমে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী, পূর্বে সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু এবং সপ্তম

আফগানিস্তান ভারতের অংশ ছিল

স্রোত ভগীরথের পশ্চাতে।"[২৭] তাই হিন্দুধর্মের লোকেরা গঙ্গাকে অতি পবিত্র স্বর্গীয় নদী মনে করেন এবং জলে নিজেকে ধৌত করে নিজেকে পবিত্র করেন।

এছাড়া রসুল (স) নিজেও অনেকবার হিন্দুস্থান অর্থাৎ ভারতবর্ষের অভিযানের কথা সাহাবীদের কাছে বলেছেন। এ বিষয়ে আবু হুরায়রার (রা) বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদিস পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন- "রসুল (স) আমাদের হিন্দুস্থানের যুদ্ধের ওয়াদা দিয়েছিলেন। যদি আমি ঐ যুদ্ধের সুযোগ পাই তাহলে তাতে জান-মাল উৎসর্গ করব। আর যদি তাতে নিহত হই তাহলে আমি শহীদদের মধ্যে মর্যাদাবান গণ্য হবো। আর যদি প্রত্যাবর্তন করি, তা হলে আমি আবূ হুরাইরা (রা) জাহান্নাম থেকে মুক্ত হবো।"[২৮]

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম দলগতভাবে ইসলাম গ্রহণ শুরু হয় আফগানিস্তান থেকে এবং তখন আফগানিস্তান ভারতবর্ষের অংশ ছিল। ইসলামের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি আফগানিস্তানে নিজ গোত্রের লোক মাধ্যমে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে লেখেন- "আমি নিজে এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি আপনারাও সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন আশা করছি। স্রষ্টা ছাড়া কোন সৃষ্টির কাছে নতি স্বীকার করাকে ইসলাম ধর্ম নিষেধ করেছে। সংশোধিত, সভ্য, চরিত্রবান ও উন্নত হয়ে স্বর্গের অধিকারী হওয়ার পূর্ণ পদ্ধতি লাভ করে আমরা উপকৃত হয়েছি। তাই আপনাদের কল্যাণ কামনায় এই পত্র প্রেরণ।" তাঁর পত্র পেয়ে আফগানিস্তান থেকে কয়স নামের একজন গোত্রপতি কিছু লোকজন সাথে নিয়ে মদিনায় আসেন। রসুলের (স) সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সাম্যক জ্ঞান লাভ করে ধর্ম গ্রহণ করেন। রসুল (স) কায়স নাম বদলিয়ে রাখেন আবদুর রশিদ (রা)। আফগানিস্তানে যাওয়ার সময় মদিনা থেকে তাঁদের সাথে একজন সাহাবী (নাম অজ্ঞাত) গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে অনেক মানুষকে ইসলামে দিক্ষিত করেন।[২৯]

পাকিস্থানে প্রথম ইসলামের বানী পৌঁছে স্থল পথে। কিন্তু ঐ সময় আশানরূপ কোন সারা পাওয়া যায়নি। কারণ, আফগানিস্থান এবং মালাবারের মতো পাকিস্থানে ইসলাম প্রচার এতোটা সহজ এবং সুখকর ছিল না। বিভিন্ন সময় বেশ কয়েকজন সাহাবী সেখানে গেলেও প্রভাবশালী হিন্দুদের কারণে খুব বেশি মানুষকে ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত কারতে পারেননি। রাজনৈতিক ভাবে পাকিস্থান বিজয় অভিযান শুরু হয়েছিল ১৫ হিজরিতে হজরত ওমরের (রা) খিলাফতের শুরুর দিকে সিন্ধু অভিযানের মধ্য দিয়ে। হজরত ওমর (রা) তাঁর খিলাফতের

মুহাম্মদ বিন কাসীম দেবলে/করাচীতে রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন।

শুরুর দিকে উসমান ইবনে আবুল আবী সাকাফীকে (রা) বাহরাইন ও আম্মানের গভর্নরের দায়িত্ব দেন। উসমান ইবনে আবুল আবী সাকাফী (রা) তাঁর ভাই মুগীরা সাকাফী (রা) এবং হারেস ইবনে মুররা আবদীকে (রা) দেবল ও করাচী অভিযানে পাঠান। তাঁরা সাময়িক সময়ের জন্য কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রনে নিলেও লোকসানের পরিমানই বেশি হয়।

হজরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফতে আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে (রা) ইরাকের গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং ভারতবর্ষ অভিযানের জন্য প্রথমে সিন্ধু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেন। পর্যাপ্ত খাবার এবং পানীয় জলের অভাব থাকায় তখন অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি।

হজরত আলীর (রা) খিলাফতে হজরত হারিস (রা) সিন্ধু অভিযান চালান, এতে প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের জয় হলেও পররর্তীতে শোচনীয় পরাজয় হয় এবং মুসলিম সৈন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

হজরত আমির মুয়াবিয়ার (রা) শাসনামলে ৪৪ হিজরিতে মুয়াল্লাব ইবনে আবূ সূফরী (রা) সিন্ধু সীমান্ত পার হয়ে মুলতান ও কাবুলের কাছাকাছি বান্না ও আহওয়াজ পর্যন্ত জয় করেছিলেন।[৩০]

কিন্তু বার বার ঐ এলাকাগুলো জয় হয়েছে আবার বেদখল হয়েছে। পাকিস্থান মুসলিমদের স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রনে আসে ৯৩ হিজরি অর্থাৎ ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ বিন কাসিমের সমুদ্র পথে সিন্ধু বিজয়ের পর। তিনি দেবল অর্থাৎ বর্তমান করাচী বন্দরে তার নৌবহর এনে থামান এবং রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু জয় করেন। সিন্ধু বিজয়ের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ বিন কাসিম এবং তৎকালীন ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাড়াও পুরো মুসলিম উম্মার মনোযোগ ছিল দেবল বন্দরের দিকে। এর কারণও ছিল বেশকিছু।

শ্রীলঙ্কায় যেহেতু আগে থেকেই আরব বণিকরা যাতায়াত করতো যার কারণে অনেক আরব বণিক সেখানে বিয়ে করে বাসবাস করেছিল। সেখানে বসবাসকারী মুসলিম বণিকদের মৃত্যুর পর তাঁদের স্ত্রী-সন্তানদের ইচ্ছায় শ্রীলঙ্কার তৎকালীন রাজা তাদের আরবে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। উদ্দেশ্য ছিল হজ পালন এবং মৃত পিতা বা স্বামীর জন্মস্থানে গমন; কিন্তু তারা দেবল বন্দরের কাছে পৌঁছালে কিছু জলদস্যু তাদের আটটি জাহাজ লুট করে নেয় এবং মহিলাদের নির্যাতন করে। হজাজ্জ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরের কাছে তাদের ফেরত চেয়ে দূত প্রেরণ

শ্রীলংকার মুসলিমদের ... ও নারীদের নির্যাতন/রাজা দাহির

করেন; কিন্তু রাজা দাহির এতে কোন কর্ণপাত করেননি। জলদস্যুরা তার শাসনের বহির্ভূত তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারবেন না এই অযুহাতে পুরো ঘটনাটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, যার কারণে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁর সতের বছর বয়সী ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মোহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠান। রাজা দাহির যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন তার স্ত্রী রানীবাঈ তার দাসিদের নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয় এবং রাজা দাহিরের দুই কন্যা সুর্যদেবী ও পরমলদেবীকে বন্দী করা হয়।

জলদস্যু কর্তৃক আটটি জাহাজ লুট এবং রাজা দাহিরের অসহযোগীতা যে সিন্ধু আক্রমনের একমাত্র কারণ তা কিন্তু নয়। পারস্য অভিযানে মুসলিমদের বিপক্ষে রাজা দাহির পার্শিকদের বিভিন্ন সহযোগিতা করেছিল, ইরাক থেকে একদল বিদ্রোহী পালিয়ে কারচিতে আসলে রাজা দাহির তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। এছাড়া আগের দুটি অভিযানে মুসলিমরা পরাজিত হলে তার আদেশে যুদ্ধবন্দি মুসলিমদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সার্বিক বিবেচনায় তখন সিন্ধু অভিযান মুসলিমদের কাছে জরুরি হয়ে পরে।[৩১]

সিন্ধু বিজয়ের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ বিন কাসিম মাত্র ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে রাজা দাহিরের পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে সহজেই পরাজিত করেছিলেন স্থানীয় হিন্দুদের সহযোগিতায়। রাজা দাহিরের সৈন্যদের কাছে নির্যাতিত এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বর্ণবৈষম্যে অতিষ্ঠ নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই মোহাম্মদ বিন কাসিমকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন এবং সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

সিন্ধু বিজয়ের পর থেকেই ভারতবর্ষের সাথে আরবের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আরো গভীর হতে থাকে। প্রাচীনজ্ঞানে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে জ্ঞানপিপাসু আরব মুসলিমরা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য আসতে থাকে। তারা এখানে এসে আয়ুর্বেদ, গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ও হিন্দু দর্শন শিখতে শুরু করেন। আরব মনিষী আবূ মা'শার ভারতের বানারসে এসে দশ বছর অবস্থান করেছিলে, এই সময় তিনি হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে জ্যোর্তিবিদ্যা শেখেন। খলিফা মনসুর হিন্দু পণ্ডিতদের রচিত অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করান। ব্রাহ্মগুপ্ত রচিত 'ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত' ও 'খন্ড-খাদ্যক' নামক জ্যোর্তিবিদ্যার গ্রন্থের আরবি অনুবাদ তাঁরই সময়ে হয়েছিল। প্রাচীন আরবরা ভারত থেকে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত এই ৯টি সংখ্যা গ্রহণ করে। তাঁরা এর সাথে সিফর বা শুন্য যুক্ত করে গণনাবিদ্যাকে আরো সমৃদ্ধ করে। ইউরোপীয়রা আরবদের কাছে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত গ্রহণ করে। ঋনের স্বীকৃতি হিসেবে আরবরা এই সংখ্যাগুলো কে বলতো 'হিন্দু-সাস' এবং ইউরোপীয়রা বলে এরাবিক নাম্বার।[৩২]

আরবরা ভারতবর্ষ থেকে অর্জিত জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করে এবং ইউরোপীয়রা এই জ্ঞান অর্জন করে আরবদের কাছ থেকে। ভারতবর্ষের সাথে আরবের জ্ঞানের অভিশ্রবনের সাথে সাথে বাড়তে থাকে ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রচার। সিন্ধু বিজয়ের পর থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য একের পর এক মুসলিমরা জয় করতে থাকে এবং সেই সাথে খুব দ্রুত গতিতে প্রচার ও প্রসার হতে থাকে ইসলাম ধর্মের।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের আগেই ইসলামের বাণী পৌছায় মালাবার বা কেরালায়। সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব (রা) আবিসিনিয়া থেকে নবুয়্যতের ষষ্ঠ বর্ষে মালাবারে এসেছিলেন। কিন্তু সে সময় মালাবারে তেমন কোন সারা না পেয়ে ঐ বছরই চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং যাত্রাপথে শাতি-উল-গঙ্গায় এসে থামেন।

এর পরের বছরেই মালাবারে ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্মে পৌছনোর অপার্থিব প্রক্রিয়া শুরু হয়, যখন রসুল (স) চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন তখন থেকে। নবুয়্যতের সপ্তম বর্ষে অর্থাৎ ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে রসুল (স) তাঁর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেন- "একদা মক্কার লোকেরা রসুলের (স) নিকট কোন অলৌকিক কার্য প্রদর্শনের দাবী জানালে তিনি তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন, এমন কি তারা হেরা পর্বতকে চন্দ্রের খন্ডদ্বয়ের মাঝখানে অবলোকন করলো।"[৩৩]

হজরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- "যখন চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হলো, তখন আমরা নবী করীম (স) এর সাথে মিনায় অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো চন্দ্রের একটি খন্ড হেরা পর্বতের দিকে চলে গেলো।"[৩৪]

ভারতের মালাবার অর্থাৎ কেরালার রাজা চেরামন পেরুমল (এটি তাঁর মূল নাম নয়। এটি রাজবংশের উপাধি) তিনি তাঁর প্রাসাদ থেকে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার এই দৃশ্য দেখেছিলেন। তিনি রাজ পুরোহিতদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তারা এর সঠিক কারণ বলতে পারেনি। এই ঘটনার আট বছর পর মদিনা থেকে আরব বণিকদের একটি কাফেলা মালাবারে এসে পৌছে। এই কাফেলায় ছিলেন সাহাবী মালিক বিন দিনার (রা) এবং তাঁর ছেলে হাবিব বিন মালিক (রা)। (কেউ কেউ

রাজা চেরামন পেরুমল সাহাবীর- কথা শুনে ইসলাম গ্রহন করেন

হাবিব বিন মালিককে (রা) মালিক বিন দিনারের (রা) ভ্রাতুষ্পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। তবে নাম দেখে মনে হয় ছেলে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি)। তাঁদের যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য, ধর্ম প্রচার এবং শ্রীলঙ্কায় গিয়ে প্রথম নবী হজরত আদমের (আ) কদম মোবারকের চিহ্ন জিয়ারত।

একটি কথা না বললেই নয় ইতিহাসবিদের একাংশ সাহাবী মালিক বিন দিনার (রা) এবং সূফী মালিক দিনার আল বসরি (র) এই দুই জনের জীবনী এক করে ফেলেছেন। সাহাবী মালিক বিন দিনার (রা) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ভারতের কেরালায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন আরব বণিক এবং ধর্ম প্রচারক। মালিক দিনার আল বসরি (র) ছিলেন একজন তাবেঈ, তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মস্থান বসরাতেই ১৩১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন হাসান বসরির (র) শিষ্য এবং একজন সূফী সাধক।

মালিক বিন দিনার (রা) মালাবারে এসে বাণিজ্য এবং ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তিনি ক্রাঙ্গানোরে আশেপাশের মানুষদের তাঁর ধর্ম এবং রসুলের (স) কথা প্রচার করতে থাকেন এবং সেই সাথে প্রচার করেন রসুলের (স) চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার ঘটনা। চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার কথা রাজা চেরামন পেরুমলের কানে এলে তিনি তাঁদের ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছে রসুল (স) এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। মালিক বিন দিনারের (রা) কথায় মুগ্ধ হয়ে রাজা চেরামন পেরুমল ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং ফেরত যাত্রায় আবার ক্রাঙ্গানোরে আসার জন্য মালিক বিন দিনারকে (রা) অনুরোধ জানান। মালিক বিন দিনার (রা) শ্রীলঙ্কায় হজরত আদমের (আ) কদম মোবারকের চিহ্ন জিয়ারত শেষে কিছুদিন অবস্থানের পর আবার ক্রাঙ্গানোরে ফিরে আসেন। রাজা চেরামন পেরুমল রাজ্যের দায়িত্ব তাঁর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে প্রদান করে সবার অজান্তে মালিক বিন দিনার (রা) এর সাথে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং মদিনায় যাওয়ার সময় এক কলস আদার আঁচার রসুলের (স) জন্য উপহার নিয়ে যান। এই আদার আঁচার নিয়ে হজরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- "রসুলের (স) কাছে ভারতবর্ষের রাজা আদা ভর্তি একটি কলস আনেন। রসুল (স) সবাইকে এক টুকরো করে খেতে দেন। তিনি আমাকেও এক টুকরো খেতে দিয়েছিলেন।"৩৫

রাজা চেরামন পেরুমলের ইসলামি নাম তাজউদ্দীন (রাঃ)

মদিনায় আসার পর তিনি রসুলের (স) হাতে হাত রেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং রসুল (স) তাঁর নাম রাখেন তাজউদ্দীন (রা)। ইতিহাসের কোন কোন স্থানে

রাজা চেরামন পেরুমল মদিনায় -গমন

চেরামন পেরুমল ইসলাম গ্রহণের পর - সাহাবীর বোনকে বিবাহ করেন

পাওয়া যায় রাজা চেরামন পেরুমল মক্কায় এসে রসুলের (স) কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ প্রথমত এই ঘটনার প্রত্যক্ষ্যদর্শী হজরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা), রসুলের (স) হিজরতের দশ বছর পূর্বে ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন। রসুল (স) মদিনায় আসার পর দশ বছর বয়সে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তাঁর পিতা মালিক ইবনে সিনান (রা) এবং মাতা উনায়সা বিনতে আবূ হারিসের (রা) সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।৩৬ অর্থাৎ রসুলের (স) কাছে রাজা চেরামন পেরুমল আসার ঘটনা আবূ সাঈদ খুদরী (রা) মক্কা নয় মদিনাতেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, সাহাবী মালিক বিন দিনার (রা) মক্কার নয় মদিনার বণিক ছিলেন। রসুল (স) মদিনায় আসার পর তিনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এরপর তিনি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে বের হন। তৃতীয়ত, একজন রাজা এসে রসুলের (স) কাছে স্বাচ্ছন্দে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এতো অনুকূল পরিবেশ হিজরত পূর্ববর্তী সময়ে মক্কায় কখনই ছিল না। যার কারণে ধারণা করা যায় রাজা চেরামন পেরুমল মক্কা নয় মদিনায় এসে রসুলের (স) সাথে দেখা করেছিলেন।

রাজা চেরামন পেরুমল ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর মালিক বিন দিনারের (রা) বোন রাজিয়া বিনতে দিনারকে (রা) বিয়ে করে মদিনায় কয়েক দিন অবস্থান করেন। এরপর তাঁর স্ত্রী রাজিয়া বিনতে দিনার (রা), মালিক বিন দিনার (রা), হাবিব বিন মালিক (রা) এবং তাঁর স্ত্রী হুমাইরা (রা) সহ চৌদ্দ জনের একটি কাফেলা নিয়ে কেরালা প্রত্যাবর্তণের জন্য যাত্রা করেন; কিন্তু বর্তমান ওমানের সালালাহ বন্দরে পৌঁছলে তিনি অসুস্থ হয়ে পরেন। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে তিনি কেরালায় তাঁর পরিবারের কাছে এটি পত্র লেখেন এবং পত্র বাহকদের যথাযত সম্মান করার জন্য নির্দেশনা দেন, এছাড়া তাঁর মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখার জন্য মালিক বিন দিনারকে (রা) অনুরোধ করেন। রাজা চেরামন পেরুমলের মৃত্যুর পর মালিক বিন দিনার (রা) তাকে দাফন করে কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ক্রাঙ্গানোরে পৌঁছালে রাজা চেরামান পেরুমলের পরিবারের লোকেরা তাঁদের সাধ্যমতো সম্মান এবং সহযোগিতা করেন। তাঁদের সহযোগিতায় ৭ম হিজরি অর্থাৎ ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে মালিক বিন দিনার (রা) পেরুমলের রাজধানী কর্ণক্লোর বা ক্রাঙ্গানোরে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই ভারতবর্ষে নির্মিত প্রথম মসজিদ। যা বর্তমানে চেরামন জামে মসজিদ নামে পরিচিত। মালিক বিন দিনার (রা) সেই মসজিদেই ইমামতি করতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ায় সেখানেই অবস্থান করে ধর্ম প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। অপরদিকে মালিক বিন হাবিব

ভারতবর্ষে চেরামান জামে মসজিদ

(রা) সমগ্র মালাবারে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ত্রিবাঙ্কোড়ের অন্তর্গত কওলামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং কওলাম বা কোল্লমে দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করেন। কওলাম বা কোল্লমে তিনি তাঁর স্ত্রীকে রেখে হিলী মারাওয়বীতে যাত্রা করেন এবং তৃতীয় মসজিদ নির্মাণ করেন ডিল্লি পর্বতে অর্থাৎ হিলী মারাওয়াতে। এরপর তিনি আরো সাতটি স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন।[৩৭]

চতুর্থ মসজিদ নির্মাণ করেন দক্ষিণ কানড়ের বুর্কবে অর্থাৎ পাকনূরে।
পঞ্চম মসজিদ নির্মাণ করেন মঙ্গালর নগরে।
ষষ্ঠ মসজিদ নির্মাণ করেন তেল্লীচেরীর ধর্মপত্তন অর্থাৎ দরমফতন নগরে।
সপ্তম মসজিদ নির্মাণ করেন বেপুল চালিয়াম অর্থাৎ শালিয়াত নগরে।
অষ্টম মসজিদ নির্মিত হয় জইফত্তনে অর্থাৎ বর্তমান সুরুকুন্তপুরমে। ইবনে বতুতা তা ভ্রমণ কাহিনী গ্রন্থ ইবনে বতুতার সফরনামায় এই মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন।
নবম মসজিদ পন্থারিনীতে অর্থাৎ ফন্দারিনায় নির্মাণ করেন।
দশম মসজিদ কঞ্জরকোটে নির্মাণ করেছিলেন।[৩৮]

এরপর তিনি আবারও ক্রাঙ্গানোরে ফিরে আসেন। কোন এলাকায় মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি মানে ঐ এলাকায় ইসলাম ধর্মানুসারি মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় মালাবারে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সাহাবী মালিক বিন দিনার (রা) এবং হাবিব বিন মালিক (রা) করেছিলেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁরা মালবেরেই ধর্ম প্রচার করেছেন। প্রচলিত আছে চেরামন জামে মসজিদের বাহিরে অবস্থিত তিনটি কবরের মধ্যে একটিতে মালিক বিন দিনার (রা), একটিতে হাবিব বিন মালিক (রা) এবং অন্যটিতে হুমাইরা (রা) শায়িত আছেন।
হাবিব বিন মালিক (রা) এতো দ্রুত সময়ের মধ্যে মালাবারে দশটি মসজিদ নির্মাণ করতে পেরেছিলেন সম্ভবত রাজা চেরামান পেরুমলের পরিবারের লোকদের সহযোগিতা এবং প্রভাবের কারণে। তা না হলে হিন্দু অধ্যুসিত রাজ্যে এক ঈশ্বরবাদের নতুন এই ধর্মের প্রচার এতো সহজ হওয়ার কথা নয়। সাহাবী মালিক বিন দিনার (রা) মালাবারে আসার অনেক আগে ৫১ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্মের এক ঈশ্বরবাদের বাণী নিয়ে আসেন সন্ত টমাস, ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্মের প্রথম প্রচারক তিনিই ছিলেন। তিনি মাত্র আট বছর মালাবারের দক্ষিণ অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেন এবং কয়েকটি গির্জা প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু, ৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়, ধারণা করা হয় উগ্রপন্থী কিছু হিন্দু গোপনে তাকে হত্যা করেছিল। এরপর দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কোন কাজ হয়নি।[৩৯] কিন্তু মালিক বিন দিনার এবং হাবিব বিন মালিকের (রা) ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছিল রাজ পরিবারের সমর্থনের কারণে।

ইতিহাসে আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায়, গুজরাটের রাজা ভোজ রসুলের (স) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার দৃশ্য নিজ প্রাসাদের ছাদ থেকে দেখতে পান, এর কারণ জানার জন্য রাজ্যের ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠালে তারা তাদের সাধনাবলে জানতে পান আরব দেশে একজন মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছেন এবং তিনিই তাঁর ধর্মের সত্যতা প্রকাশের জন্য আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দুই ভাগ করেছেন। এই ঘটনায় রাজা বিস্মিত হয়ে তাঁর এক বিশ্বস্ত দূতকে আরবে রসুলের (স) কাছে পাঠান। রসুল (স) রাজা ভোজের চিঠি পেয়ে একজন সাহাবীকে দূতের সাথে গুজরাটে পাঠিয়ে দেন। রাজা ভোজ সেই সাহাবীর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম রাখেন আব্দুল্লাহ; কিন্তু তাঁর এই ধর্ম পরিবর্তন প্রজারা মেনে নেয়নি। তাদের বিক্ষোভের কারণে রাজা ভোজ তাঁর ভাইকে সিংহাসনে বসান। সেই সাহাবী এবং রাজা আব্দুল্লাহর কবর গুজরাটের ধারদার শহরে আছে।[৪০]

যদি গুজরাটের রাজা ভোজের এই ঘটনা রাজা চেরামন পেরুমলের দিকে ইঙ্গিত করে তাহলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে- যে দেশের রাজা ধর্ম পরিবর্তনের কারণে রাজ্যের প্রজাদের বিক্ষোভে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন সে দেশে খুব স্বল্প সময়ে দশটি মসজিদ গড়ে ওঠা সম্ভব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু, মালাবারে মালিক বিন হাবিব (রা) খুব স্বল্প সময়ে দশটি মসজিদ গড়ে তুলেছিলেন, যা আজও ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে টিকে আছে। অর্থাৎ ইতিহাস এবং বাস্তবতা সব সময় একরকম নাও হতে পারে।
রাজা চেরামন পেরুমল মদিনা যাওয়ার আগে তাঁর ছেলে মনিবিক্রমনকে একটি তরবারী এবং কিছু জমি দিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই জমিতেই কালিকট বন্দর ওঠে। পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত তরবারী নিয়ে মনিবিক্রমনের উক্তি ছিল, "যিনি প্রস্থান করেছেন তিনি না ফেরা পর্যন্ত আমি এই তরবারীর মর্যাদা রক্ষা করবো।" এখানে তরবারী প্রদান এবং এর মর্যাদা রক্ষা মানে রাজ্যের দায়িত্বভার পালন বোঝায় কিনা তা স্পষ্ট নয়; কারণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় রাজা চেরামন পেরুমলই তাদের বংশের শেষ রাজা। ইতিহাসে আরও পাওয়া যায় মাতৃপ্রধান পরিবার হওয়ায় মনিবিক্রমন সিংহাসনে বসতে পারেননি।[৪১] মালাবারের সিংহাসনে যেই বসুক না কেন রাজা চেরামন পেরুমল যে মালাবার

সম্রাট হুমায়ুন এবং জাহাঙ্গীরের
ইসলাম গ্রহণ কারণ

ছেড়ে অন্যত্র গিয়েছিলেন এবিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করার আপাতত কোন সুযোগ নেই।

সাহাবীরা বিভিন্ন সময় শুধুমাত্র ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে এসেছেন, আবার বাণিজ্য করতে এসে ধর্ম প্রচারকারী সাহাবীর সংখ্যাও কমও নয়। যেহেতু অনেক আগে থেকেই আরব বণিকরা বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষ, চীন এবং ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে যেত, ইসলাম ধর্ম গ্রহনের পর তাঁরা বাণিজ্যের সাথে ধর্ম প্রচারকে যুক্ত করে নেন। মূলত বণিক সাহাবীরাই ভারতবর্ষে পর্যাপ্ত সংখ্যক তাবেঈ তৈরি করেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বণিক সাহাবী এসে ঐ তাবেঈদের ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

সাহাবীদের পর ভারতবর্ষে আসেন তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ এবং আহলে বায়াতের সিলসিলার সূফীরা। তারাই মূলত ভারতবর্ষে ইসলামের প্রসার ঘটান। বিশেষত আরব, আফগানিস্তান, ইরান ও ইরাক থেকে আগত সুফী সাধকরা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত করেন। বিভিন্ন সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উদারনীতিতে মুগ্ধ হয়ে হিন্দু বা বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এমন ঘটনাও কম নয়। মুঘল সম্রাট হুমায়ূন তাঁর শাসনামলে রাজা তিলক চাঁদের স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের কথা জানতে পেয়ে তাকে একটি মেলা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন। উঠিয়ে আনার পর সম্রাট হুমায়ূনের অনুশোচনা হলে তিনি তিলক চাঁদকে ডেকে পাঠান এবং সসম্মানে তাঁর স্ত্রীকে ফেরত দেন। এতে তারা বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়ে দুজনেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৪২]

উদারনীতি ছাড়াও ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কাঠোরতার ঘটনা যে একেবেরেই ঘটেনি তা কিন্তু নয়। মুসলিম বাদশাহদের মধ্যে টিপু সুলতানের শাসনামলে এরুপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। ১৭৯৯ সালে মালাবারের জনগণের প্রতি তিনি একটি নির্দেশনা জারি করেন- "বিজয়কালীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত চব্বিশ বছর যাবত আপনারা একটি বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে আচরণ করছেন এবং বর্ষাকালীন যুদ্ধে আমাদের অনেক সৈন্যকে হত্যা করেছেন। যা অতীত হয়ে হয়েছে তা তো হয়েছে। এখন থেকে আপনাদের অবশ্যই বিপরীত আচরণ করতে হবে, সুনাগরিকের মতো শান্তভাবে বাস করতে হবে এবং আপনাদের নিকট যা পাওনা তা শোধ করতে হবে। যেহেতু আপনাদের মধ্যে অভ্যাস আছে এক জন নারী দশ জন পুরুষকে সঙ্গ দেবে এবং আপনারা আপনাদের মা বোনদের এ ধরণের অশ্লীল কাজে বাঁধা দেন না, সে জন্য জন্ম হয় ব্যভিচারের। ফলে আপনাদের পারস্পারিক সম্পর্ক

টিপু সুলতান জোর করে ধর্মান্তরিত করেন

মায়দানের জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও বেশি নির্লজ্জ হয়ে পড়ে। আমি আপনাদের পাপকাজ পরিত্যাগ করে অবশিষ্ট মানবজাতির মতো হওয়ার প্রয়োজনীয়তা জানাচ্ছি। যদি আপনারা এ আদেশের প্রতি অবাধ্য হন, তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আপনাদের সবাইকে ইসলামে দাখিল করে সম্মান জানানো হবে এবং সকল প্রধান ব্যক্তিকে কুচকাওয়াজ করে রাজধানীতে নিয়ে আসা হবে।"

এই নোটিশ পাওয়ার পর মালাবারে বিদ্রোহ শুরু হয়, যার কারণে টিপু সুলতান ১৭৮৯ সালে বিশ হাজার সৈন্য পাঠান বিদ্রোহ দমনের জন্য এবং নির্দেশ জারি করেন সবাইকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে এবং কেউ পালিয়ে গেলে তাঁর ঘরবাড়ি জালিয়ে দেয়া হবে। ঐ সময় কয়েক হাজার হিন্দুকে মুসলমান বানিয়ে খতনা করানো হয়। পরবর্তীতে বৃটিশ বাহিনী টিপু সুলতানকে পারাজিত করলে ধর্মান্তরিতদের অনেকে পূর্বের ধর্মে ফিরে যায়।[৪৩] উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে টিপু সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ কিন্তু বাস্তবায়ন পন্থা ছিল কঠোর। এছাড়া জোরপূর্বক কাউকে ধর্মে দিক্ষিত করা ইসলাম ধর্মের শিক্ষা নয় এই ঘটনাকেই সুবিধাপন্থী ইতিহাসবীদগণ বিভিন্ন সময় অতিরঞ্জিত করে প্রচার করেছেন।

মালাবারে ৭ম হিজরি অর্থাৎ ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মসজিদ নির্মাণ হওয়ারও প্রায় ১২ বছর আগে নবুয়্যতের ৭ম বর্ষ অর্থাৎ ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে ইসলামের বাণী পৌঁছায়। রসুল (স) মক্কা থাকাকীলান নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে সাহাবী আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব (রা) তাঁর ছেলে আমির বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) এর সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে আমির বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) মদিনায় গমন করেন কিন্তু আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব (রা) ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশির উপহার দেয়া জাহাজে চড়ে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য চীনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রায় বের হন। তাঁর নেতৃত্বে এই দলে অন্য সাহাবী যারা ছিলেন -

(১) হজরত কায়স ইবনে হুজাইফা (রা),
(২) হজরত উরওয়া ইবনে আসাসা (রা) এবং
(৩) হজরত আবু কায়স ইবনে হারিস (রা)।

তাঁদের সাথে আবিসিনিয়ায় ইসলাম গ্রহণ করা কয়েকজন তাবেঈ এবং হাবশি গোলাম ছিল। তাঁরা জাহাজ নিয়ে যাত্রা শুরু করার পর নবুয়্যতের ৭ম বর্ষে অর্থাৎ ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে মালাবারে এসে পৌঁছান; কিন্তু মালাবারে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যাশা অনুসারে কোন ফল পাননি। এছাড়া তাঁদের মূল লক্ষ্য যেহেতু ছিল চীন যার কারণে তাঁরা মালাবারে বেশি দিন অবস্থান না করে চীনের উদ্দেশ্যে রওনা

দেন। চীন যাওয়ার পথে একই বছর তাঁদের জাহাজ এসে বর্তমান চট্টগ্রামের প্রাচীন দেবগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করে। এখানে তাঁরা ইতিবাচক সারা পান, যার কারণে আট বছরের কিছু বেশি সাময় বাংলাদেশে ধর্ম প্রচার করেন এবং এই সময় অনেকেই ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হন।[৪৪]

ইতিহাসের বিভিন্ন স্থানে ঐ দলের সাথে বাংলাদেশে আগত আরও তিন জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন-

(১) হজরত জাফর ইবনে আবূ তালিব (রা)
(২) হজরত ওয়াহাব ইবনে মালিক (রা)
(৩) হজরত তামিম আনসারি (রা)

জাফর ইবনে আবূ তালিবের (রা) বাংলায় আসার কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি সাহাবীদের মধ্যে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী দ্বিতীয় দলে ছিলেন। ছোট একটি দল নিয়ে হাবশায় হিজরত করেন এবং বাদশাহ নাজ্জাশির নিকট আশ্রয় নেন। কিছু দিন পর আবার মক্কায় ফিরে আসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ৭ম হিজরিতে এবার তিনি মদিনায় যান। পরের বছরেই বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিপক্ষে মুতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে কার পর কে পতাকা বহন করবেন তা রসুল (স) পূর্বেই নির্দেশনা দিয়েছিলন। তিনি যাদের নাম বলেছিলেন তাঁরা হলেন-
যায়েদ ইবনের হারেসা (রা), জাফর ইবনে আবূ তালিব (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) ব্যতিত অন্য তিন জনই সে যুদ্ধে শহীদ হন।[৪৫] মুতার যুদ্ধে জাফর ইবনে আবূ তালিবের (রা) দুই হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার করণে আল্লাহ জান্নাতে তাঁকে দুই হাতের বদলে দুটি ডানা দান করেন। এই ডানা দিয়ে তিনি জান্নাতের যেকোন স্থানে উরে বেড়ান। এজন্য তাঁকে জুলজানাহাইন বা দু' ডানাধারী বলা হয়। এবিষয়ে হাদিসে পাওয়া যায়। হজরত ইবনে ওমর (রা) বলেন- "তিনি যখন জাফর ইবনে আবূ তালিব (রা) এর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর কে সালাম করতেন তখন বলতেন, হে দু' ডানাবিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র! আসসালামু আলাইকা।"[৪৬]

আবূ ওয়াক্কাস (রা) এর পূর্ণ নাম আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওয়াহাইব ইবনে আবদে মানাফ। সম্ভবত আবূ ওয়াক্কাস মালিক (রা) এর নামটিই ইতিহাসে ওয়াহাব ইবনে মালেক (রা) নামে অন্য আরেক সাহাবীর নাম হিসেবে লেখা হয়েছে। ইবনে ইসহাক প্রণীত সিরাতে রাসুলুল্লাহ (স) গ্রন্থে আবিসিনিয়া

F-2

হিজরতকারীদের নামের তালিকায় ওয়াহাব ইবনে মালেক (রা) নামে কোন সাহাবীর নাম পাওয়া যায় না।

রসুল (স) মদিনায় হিজরতের পূর্বে মাদিনার কোন সাহাবী আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন এরকম ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যা দু একটি ঘটনা পাওয়ায় যায় সেটিও অষ্টম হিজরির পর। এছাড়া হজরত তামিম আনসারি (রা) মদিনার সাহাবী ছিলেন এবং তিনি রসুল (স) মদিনায় হিজরতের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন; যার কারণে নবূয়াতের ৫ম বর্ষে অর্থাৎ তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ৮ বছর আগে আবিসিনিয়ায় এসে আবূ ওয়াক্কাস মালিক (রা) এর সাথে বাংলায় আগমন করেছন এমনটা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

এক দল ইতিহাসবিদের ধারণা আবূ ওয়াক্কাস মালিক (রা) বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে সিলাহাত বন্দর হয়ে চীনে গিয়েছিলেন; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এ পথে নৌযানে চীনের মূল ভূখন্ডে বা ক্যান্টন বন্দরে যাওয়া সম্ভব নয়। যারা চীনের মূল ভূখন্ডে যাতায়াত করতো তারা সিকিম হয়ে সিল্করোডের স্থলপথে চীনে যেতে; তাছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদ তিব্বতের মানস সরোবরে উৎপন্ন হয়ে আসাম হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে মিলেছে, চীনের মুল ভুখন্ডে প্রবেশ করেনি। এপথে ক্যান্টন বন্দরে যেতে হলে আসামে জাহাজ রেখে সিকিম সংযুক্তকারী সিল্করোডে দিয়ে নূন্যতম বারোশত মাইল স্থলপথ পাড়ি দিলে তারপর ক্যান্টন বন্দর। আবূ ওয়াক্কাস মালিক (রা) যেহেতু অন্যকোন বণিকদের জাহাজে করে আসেননি, এসেছিলেন উপহার পাওয়া নিজস্ব জাহাজে; যে কারণে তিনি জাহাজটি আসামে রেখে নূন্যতম বারোশত মাইল স্থলপথ পাড়ি দিয়ে ক্যান্টন বন্দরে যাবেন এমনটা হওয়ার কথা নয়। এছাড়া আরব বণিকদের লিখিত ইতিহাসে আরব-চীন নৌপথের বিবরণে সান্দের ফাওলাত, বাতুম, কাদার ও সিফন বন্দরের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সবই চীন সাগরে। আর যেহেতু তিনি চীনের সমুদ্র বন্দরে গিয়েছিলেন তাই বাংলাদেশ থেকে প্রচলিত সমুদ্র পথেই যাত্রা করবেন এটাই স্বাভাবিক।

তাঁরা চট্টগ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করে ৩ হিজরি অর্থাৎ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে চীনের ক্যান্টন বন্দরে পৌঁছান।[৪৭] সেখানে আবূ ওয়াক্কাস মালিক (রা) চীনের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি সাহাবী মসজিদ, আবূ ওয়াক্কাস (রা) মসজিদ, ক্যান্টন মসজিদ বা হুইসাং মসজিদ' নামে পরিচিত।
আবূ ওয়াক্কাস মালিকের (রা) হিজরতকালীন সময়কে এভাবে সাজানো যেতে পারে-

যেখানে পৌঁছান	হিজরি সন	খ্রিষ্টাব্দ
আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া)	নবুয়্যতের ৫ম বর্ষ	৬১৫
মালাবার (বর্তমান ভারতের কেরালা)	নবুয়্যতের ৭ম বর্ষ	৬১৭
শাতি-উল গঙ্গা (বর্তমান চট্টগ্রাম)	নবুয়্যতের ৭ম বর্ষ	৬১৭
চীনের ক্যান্টন সমুদ্র (বর্তমান কুয়াংচৌ বন্দর)	৩ হিজরি	৬২৫

আবূ ওয়াক্কাস মালিক (রা) জীবনের অবশিষ্ট সময়টি ক্যান্টন বন্দরেই ধর্ম প্রচার করেন এবং চীনের সমুদ্রতীরে ক্যান্টন মসজিদের পাশে তাঁর মাজার রয়েছে। অপর দুজনের মাজার ফী-কীন প্রদেশের চুয়া-চু বন্দরের লিং পাহাড়ে রয়েছে। আরেক জন চীনের অভ্যন্তরে চলে যাওয়ায় তাঁর মাজার অজ্ঞাত।[৪৮] আরেকটি মত প্রচলিত আছে, কায়স ইবনে হুজাইফা (রা) চীনে আসার পর মঙ্গোলিয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। ধারণা করা হয় তাঁর মাজার চীন মঙ্গোলিয়ার বর্ডারের কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত। উরওয়া ইবনে আসাসা (রা) এবং আবু কায়স ইবনে হারিস (রা) এর চীনে পৌছানোর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যার কারণে ধারণা করা হয় বাংলাদেশের কোথায়ও তাঁদের মাজার অজ্ঞাত অবস্থায় রয়েছে।

আবূ ওয়াক্কাস (রা) যেহেতু বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ছিলেন এই সময়ে শুধুমাত্র চট্টগ্রামে অবস্থান করেছেন তা কিন্তু নয়। তাঁরা সম্ভবত গঙ্গাবন্দর থেকে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডেও প্রবেশ করেছিলেন এবং দেশের উওরাঞ্চলে দীর্ঘ সময় ধর্ম প্রচার করেছেন। উওরাঞ্চলে ধর্ম প্রচারের কারণ হতে পারে তিনটি-

প্রথমত, আরব বণিকরা যেহেতু অনেক আগে থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সিলাহাত বন্দর হয়ে কামরূপে গিয়ে চন্দনকাঠ সংগ্রহ করতেন, এর অর্থ সিলাহাত বন্দর অর্থাৎ সিলেট আরবদের কাছে আগে থেকেই পরিচিত ছিল এবং তখন সেখানেও যথেষ্ঠ মানব বসতি ছিল বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ জনপদ ছিল ছিল সিলাহাত বন্দরের ঠিক বিপরীত পাশে, ভারত থেকে আসা তিস্তা নদী যেখানে এসে মিলিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদে। এই তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদের সংযোগস্থলে স্থানীয় ছোট ছোট বন্দর ছিল যা আভ্যান্তরীণ বাণিজ্যের জন্য জনপ্রিয় ছিল। বর্তমান কুড়িগ্রামের চিলমারী ঘাটের আট/ দশ মাইল ভেতরে প্রাচীন দুটি ছোট বন্দর ছিল, নদী ছোট হয়ে যাওয়ায় তা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে যারা ভারতের মূলভূখন্ড হয়ে নদী পথে বাংলাদেশে এসেছেন

তাঁদের অধিকাংশই এসেছেন এই তিস্তা নদী হয়ে। ভারতের মূল ভূখন্ড থেকে তিস্তা, করতোয়া নদী দিয়ে খুব কম সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদে আসা যেত এবং ব্রহ্মপুত্র নদে দিয়ে সহজেই সিলাহাত বন্দর এবং গঙ্গা বন্দর যাওয়া যেত; যার কারণের দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার প্রয়োজন হতো না। তাছাড়া বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে ভারতের সিকিম হয়ে তিব্বতে যাওয়ার তখন একটি প্রাচীন পথ ছিল। অনেক আগে থেকেই ভূটান থেকে টঙ্গন ঘোড়া বিক্রয় করার জন্য ভূটানের বণিকরা রংপুর এবং দিনাজপুরে আসতো বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়।[৪৯] হজরত শাহ্ জালাল (র) তিনি ইয়েমেন থেকে ভারতের দিল্লিতে এসে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার (র) সাথে দেখা করার পর এ পথেই সিলেটে এসেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল বেশ জনবহুল এবং সমৃদ্ধ এলাকা ছিল রামায়নেও তা উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, এই একালায় বেশির ভাগ জনগণ ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু, যারা জন্ম থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা বৈষম্যের স্বীকার হতো; যার কারণে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উপায় খুঁজছিল এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য।

তৃতীয়ত, তৎকালীন সময়ে রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে বিরুপ ধারণা লালন করতেন।[৫০] তাঁর বৌদ্ধ পীড়ন নীতির কারণে কোনঠাসা হয়ে পরা বৌদ্ধরা উত্তরাঞ্চলে বসবাস করত। এছাড়া সিকিম হতে তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকরা নিয়মিত এখানো আসতো।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ হচ্ছে সমাজে যারা অবহেলিত এবং নির্যাতিত তাদেরই আগে ধর্মের বানী পৌঁছে দেয়া। সম্ভবত এই কারণেই আবূ ওয়াক্কাস (রা) বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দীর্ঘদিন ছিলেন এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু ও নির্যাতিত বৌদ্ধদের মাঝে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। যেহেতু ইসলামের বাণী গ্রহণ করার সম্ভব্য মানুষের সংখ্যা বেশি ছিল এছাড়া সিকিম হয়ে স্থল পথে এবং তিস্তা হয়ে নৌপথে সহজেই এখানে আসা যেতো; যার কারণে আরব, ইরাক, ইরান, ইয়েমেনসহ অনেক দেশ থেকে ধর্ম প্রচারক বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এসেছেন।

প্রাচীন চিলমারী ঘাটে যে বিভিন্ন সময় সাহাবী বা তাবেঈনগণ এসে ধর্ম প্রচার করেছেন তাঁর প্রমান পাওয়া যায় এখানে আবিষ্কৃত প্রাচীন একটি মাসজিদ থেকে। বর্তমান লালমনিরহাট জেলার রামদাশ গ্রামের 'মজদের আড়া' নামক জঙ্গলে ১৯৮৭ সালে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে

সাহাবী মসজিদ

সংগৃহীত তথ্যে জানা যায় জনাব শামসুল হক নামের এক ব্যক্তি ঐ জঙ্গলময় স্থানটি ক্রয় করে ব্যবহার উপযোগী করার চিন্তা করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি এবং তাঁর ভাই জনাব আইউব আলী ঐ স্থানটিকে আবাদযোগ্য করার জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করতে গেলে বেরিয়ে আসে প্রাচীন আমলের বেশ কিছু ইট; যেহেতু রামদাশ গ্রাম হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা যার কারণে ঐ এলাকায় বসবাসকারী হিন্দুরা এটিকে মন্দির বলে দাবি করে এবং দীর্ঘদিন এটি হিন্দুদের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির বলেই ধারণা ছিল। বাড়ির কাজের জন্য ঐ ধ্বংসাবশেষ থেকে কিছু ইট আনার পর জনাব আইউব আলী একটি চওড়া একটি ফলকে নানা ধরনের ফুলের নকশা ও আরবি হরফে কলেমায়ে তৈয়্যেবাসহ হিজরি ৬৯ সন লেখা দেখতে পান। বিষয়টি আশেপাশে প্রচারিত হলে স্থানীয়রা আগ্রহ নিয়েই খনন কাজ শুরু করার পর মেহরাব দেখে তারা এটিকে মসজিদ বলে নিশ্চিত হন। স্বাভাবিক ভাবেই ঐ সময় মুসলমানের সংখ্যা কম থাকায় মসজিদটির আকারও ছিল কম। মাত্র ২১ ফুট দৈর্ঘ্য এবং মাত্র ১০ ফুট প্রস্থের এই মসজিদে আনুমানিক ২০ জন মানুষের নামাজ পরার মতো জায়গা ছিল।[৫১]

প্রাচীন মসজিদ উদ্ঘাটনের সাথে সাথেই স্থানীয় লোকজন ঐ স্থানে টিন দিয়ে একটি মসজিদ তৈরি করেন এবং এর নাম দেয়া হয় হারানো মসজিদ বা সাহাবী মসজিদ। বর্তমানে এটি আধুনিক মসজিদ কমপ্লেক্সে রুপন্তরিত হয়েছে এবং হিজরি ৬৯ সন লেখা সেই ফলকটি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এখনও রংপুরের তাজহাট জমিদার বাড়ি জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[৫২]

ইতিহাস রচয়িতাদের কেউ কেউ ধারণা করেন লালমনিরহাটের মসজিদ সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) নির্মাণ করেছিলেন। আরেকটি মত পাওয়া যায়, আবূ ওয়াক্কাস (রা) ইসলাম প্রচারের জন্য চীন যাওয়ার পথে কিছুকাল রংপুর এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন এবং এই মসজিদটি তৈরি করেন। কারো কারো ধারণা মতে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) ভাই বাংলায় এসেছিলেন এবং তিনিই এই মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এই তিনটি ইতিহাসের একটিও সঠিক নয়।

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) এর দীর্ঘ কর্মময় জীবনে বাংলায় এসেছিল এমন কোন তথ্য তাঁর নির্ভরযোগ্য জীবনীতে কোথাও পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল ৬৯ হিজরিতে এবং সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) মৃত্যুবরন করেন ৫৫ হিজরিতে; অর্থাৎ এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল তাঁর ওফাতের ১৪ বছর পর। মৃত্যুর ১৪ বছর পর মসজিদ নির্মাণ করা তাঁর পক্ষে

সম্ভব হওয়ার কথা নয়। তিনি যদি বাংলাদেশে আসতেন তবুও এই এই মসজিদ নির্মাণ করতে হলে তাঁর ৯৯ বছর পর্যন্ত হায়াতের প্রয়োজন ছিল।

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) ভাই এক সময় বাংলায় এসেছিলেন এই ধারনাটিও সঠিক নয়। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) তিন ভাই সম্পর্কে তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়।

আমির বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা)- ইসলামের প্রচারের প্রথম দিকে তিনি আবিসিনিয়া হিজরত করেন। হজরত ওমর (রা) এর খিলাফতে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেছিলেন।[৫৩]

উতবা বিন আবূ ওয়াক্কাস- নবুয়্যতের পূর্বে তিনি একজন লোককে হত্যা করে মক্কা থেকে মদিনায় পালিয়ে গিয়েছিল। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি। প্রাচীন কিছু ইতিহাসে পাওয়া যায় তিনি যুদ্ধে ইসলামের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন।[৫৪]

উমাইর ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা)- ১৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদর যুদ্ধের শহীদ হয়েছিলেন এবং তিনি বদর যুদ্ধের শহীদ হওয়া সর্বকনিষ্ঠ সাহাবী।[৫৫]

যার কারণে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) কোন ভাই এই মসজিদ নির্মাণ করেছেন এমন তথ্যের কোন সত্যতা পাওয়া যায় না। তবে লালমনির হাটের এই মসজিদ যেহেতু ৬৯ হিজরি অর্থাৎ উমাইয়া খিলাফতের সময়ে নির্মিত, সেই প্রক্ষাপটে ধারণা করা হয় প্রাচীন এই মসজিদটি কোন সাহাবী নির্মাণ করেছেন। রসুলের (স) কাছে অল্প বয়সী কিশোর কিশোরী যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মূলত তারাই বড় হয়ে হাদিস বার্ণনাকারী, কোরআন ও হাদিস বিশারদ এবং ধর্মপ্রচারক হন। তাঁদের হাত ধরেই ধর্মশিক্ষার সমৃদ্ধি এবং পৃথিবীর কোনায় কোনায় ধর্মপ্রচার হয়েছিল। হতে পারে অল্প বয়সে ইসলাম গ্রহণকারী কোন কিশোর সাহাবী রসুলের (স) ওফাতের ৫৯ বছর পর বাংলাদেশে ধর্ম প্রচারে এসে ৬৯ হিজরিতে এই মসজিদ নির্মাণ করেছেন, আবার এও হতে পারে ইসলামের প্রথম যুগে বাংলাদেশে আসা সাহাবীদের হাতে হাত রেখে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাবেঈন হয়েছেন তাঁদের কেউ এই মসজিদ নির্মাণ করেছেন। প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভাল জানেন, তবে এখানে যে সাহাবীদের পদধূলি পরেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা না বললেই নয়, এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ খ্যাত মালাবারের চেরামন জামে মসজিদ। সাহাবী মালিক বিন দিনার

(রা) ৭ম হিজরি অর্থাৎ ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন; কিন্তু এই মসজিদ নির্মাণ হওয়ার ১২ বছর আগে নবুয়্যতের ৭ম বর্ষ অর্থাৎ ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে আবূ ওয়াক্কাস মালেক (রা) বাংলাদেশে আসেন এবং ৯ বছর অর্থাৎ ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ ৩ হিজরি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করে ঐ বছরেই চীনে পৌঁছান। এর অর্থ দাড়ায় সাহাবীদের এই প্রথম দল বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার ৪ বছর পর মালাবারে চেরামন জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদি তাই হয় তাহলে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, আবূ ওয়াক্কাস মালেক (রা) বাংলাদেশে ৯ বছর অবস্থানকালে তিনি কি কোন মসজিদ নির্মাণ করেননি? হয়তো করেছিলেন, সম্ভবত নদীগর্ভে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যদি ঐ সময়ে বাংলাদেশে নির্মিত কোন মসজিদ আবিস্কৃত হয় তাহলে সেই মসজিদই হবে ভারতবর্ষে নির্মিত প্রথম মসজিদ।

বাংলাদেশে প্রথম মসজিদ নির্মাণ সাহাবীদের যুগেই হয়েছে এবং এরই ধারাবহিকতায় তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, বিভিন্ন সময়ে বাংলায় আগত ধর্ম প্রচারক এবং সূফী সাধকগন বাংলায় মাসজিদ নির্মাণ করেছেন। পরবর্তিতে বাংলার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তাঁদের সহযোগীতায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করলে বাংলাদেশে প্রথম রাজনৈতিকভাবে ইসলাম প্রবেশ করে। তখন থেকেই সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এসময় দেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদী জমি তৈরি করার জন্য ছোট ছোট দলকে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হতো, তারা সেখানে চাষাবাদ এবং মানুষের বসবাসের উপযোগী জমি তৈরি করতো। ধর্মপ্রাণ মুসলিম কৃষকরা সেখানেই বাঁশ-ছন দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করেন, এগুলোকে তখন বলা হতো সাধারন মসজিদ। মুসলমানের সংখ্যা খুব কম হওয়া সেই সাধারণ মসজিদের আকার ছিল খুব ছোট। মুসলিম শাসক এবং স্থানীয় সম্পদশালী ব্যক্তিদের সহযোগীতায় কিছু সাধারন মসজিদ ইট দিয়ে পাকা করে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই সাধারণ মসজিদের প্রায় সবগুলোই বিলুপ্ত হয়ে গেলেও হাতে গোনা দু'চারটি মসজিদ বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেগুলো ব্যবহার এমনকি প্রবেশ উপযোগী নয়। এর মধ্যে একমাত্র ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানায় প্রায় সাড়ে চারশত বছর আগে নির্মিত একটি মসজিদ, সম্ভবত এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট মসজিদ যেখানে নামাজ পড়তে পারে ইমামসহ মাত্র চারজন।[৫৬] এছাড়া তখন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় মুসলিম

শাসকদের উদ্যোগে নির্মাণ করা হতো জামে মসজিদ। লোক সমাগম বেশি হওয়ায় এই মসজিদগুলো আকারে বড় হতো, বিশ থেকে একশত জন পর্যন্ত নামাজ পরার উপযোগী ছিল এগুলো। এছাড়া ইট দিয়ে নির্মাণ করায় স্থায়িত্ব ছিল অনেক বেশি এবং এগুলোর নির্মাণশৈলীও মনমুগ্ধকর।

ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলায় প্রবেশের পরবর্তী সময় বিশেষত ১৪০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্মিত জামে মসজিদগুলোর প্রায় অর্ধেকই এখনও টিকে আছে। এই সময়ে বাংলাদেশে নির্মিত মসজিদে সংখ্যা হিসেব করলে এরূপ চিত্র পাওয়া যায়-[৫৭]

সময়কাল	সাধারণ মসজিদ	জুমা মসজিদ	মোট
১২০০-১২৫০	২	০	২
১২৫০-১৩০০	৩	১	৪
১৩০০-১৩৫০	২	০	২
১৩৫০-১৪০০	৪	১	৫
১৪০০-১৪৫০	৫	০	৫
১৪৫০-১৫০০	৫২	৯	৬১
১৫০০-১৫৫০	২৮	২৮	৫৬
১৫৫০-১৬০০	১৫	২	১৭
১৬০০-১৬৫০	৭	০	৭
১৬৫০-১৭০০	১৭	০	১৭
১৭০০-১৭৫০	৮	০	৮
১৭৫০-১৮০০	৪	০	৪
মোট	১৪৭	৪১	১৮৮

ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়েরও অনেক আগেই যেহেতু বাংলাদেশে ইসলাম এসেছে যার কারণে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দের আগেই বাংলাদেশে ব্যক্তি উদ্যোগে বেশ কিছু মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৫৮] কিন্তু,

বাংলায় সাহাবীদের নাম

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় সেগুলো একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

একটি বিষয় বলা আবশ্যক, প্রাক-ইসলামিক যুগ থেকেই আরব বণিকরা জাহাজে করে বাংলায় আসতেন এবং ইসলামের শুরু থেকেই বেশ কিছু সাহাবী শুধুমাত্র ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলায় এসেছেন, এর মানে এই নয় শুধু ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসা সাহাবীরাই কেবল ধর্ম প্রচার করেছেন। আরব বণিকরা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নিয়মিত যেখানে যেতেন সেখানেই বণিক সাহাবীরা ধর্মপ্রচার করেছেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, তবে বাংলায় আগত বণিক সাহাবীদের নাম বাংলার ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যায় না বললেই চলে। বিভিন্ন সময় যেসব সাহাবী ছোট ছোট দল নিয়ে শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলায় এসেছেন শুধু তাঁদের কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন-

(১) রসুলের (স) জীবদ্দশায়- আবূ ওয়াক্কাস মালেক ইবনে ওয়াহাব (রা), হজরত কায়স ইবনে হুজাইফা (রা), হজরত উরওয়া ইবনে আসাসা (রা), হজরত আবু কায়স ইবনে হারিস (রা)

(২) হজরত ওমর (রা) এর খিলাফতে (১৩-২৩ হিজরি)- আব্দুল্লাহ ইবনে উতবান (রা), আসেম ইবনে আমর আত তামীমী (রা), ছুহার ইবনে আল-আবদী (রা), সুহাইব ইবনে আদী (রা), আল হাকাম ইবনে আবূল আছ সাফাকী (রা), মামুন (রা) এবং মুহাইমিনুল (রা)

(৩) হজরত ওসমান (রা) এর খিলাফতে (২৪-৩৫ হিজরি)- উবাইদুল্লাহ ইবনে মা'মার আত তামীমী (রা), আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা)

(৪) হজরত আমির মুয়াবিয়া (রা) এর খিলাফতে (৪০-৬০ হিজরি)- সিনান ইবনে সালামাহ (রা) মুহাল্লাব ইবনে আবু সুকারী (রা)[৫৯]

তাঁদের ত্যাগ এবং শ্রমের কারণেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে পৃথিবীর কোনায় কোনায়।

তথ্যসূত্র-

(১) মওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, করাচী, ১৩৪৩ হিজরি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১

(২) পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

(৩) মওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (র), আর রাহীকুল মাখতূম, ভারত, ১৩৯৬ হিজরি, পৃ. ১৬৭

(৪) (ক) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র), সীরাতে রাসুলুল্লাহ (স), মদিনা, পৃ. ১৭৬

(খ) আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম মুআফিরী (র), সীরাতুন নবী (স), মিসর, ১ম খন্ড, পৃ. ২৮৪

(খ) শাইখ মোহাম্মদ ইসমাইল পানিপথী, ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, লাহোর, ১৯৬১, পৃ. ১৩২

(৫) ইবনে হিশাম (র), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১

(৬) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২

(৭) মওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

(৮) (ক) ইবনে হিশাম (র), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭

(খ) ইবনে ইসহাক (র), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭

(৯) শাইখ মোহাম্মদ ইসমাইল পানিপথী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

(১০) সৈয়দ সুলেমান নাদভী (র), আরবের নৌবহর, মুম্বাই, ১৯৩১, পৃ. ২৮

(১১) শাইখ মোহাম্মদ ইসমাইল পানিপথী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০

(১২) মওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

(১৩) শাইখ মোহাম্মদ ইসমাইল পানিপথী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭

(১৪) শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, হাদিস শরীফ বাংলা মর্মবাণী, ২০২১, পৃ. ৯

(১৫) আল কোরআন, সুরা বাকারা ০১, আয়াত ২১৮

(১৬) আল কোরআন, সুরা আল ইমারান ৩, আয়াত ১৯৫

(১৭) আল কোরআন, সুরা নিসা ৪, আয়াত ১০০

(১৮) আল কোরআন, সুরা তওবা ৯, আয়াত ২০

(১৯) আল কোরআন, সুরা আনফাল ৮, আয়াত ৭৪

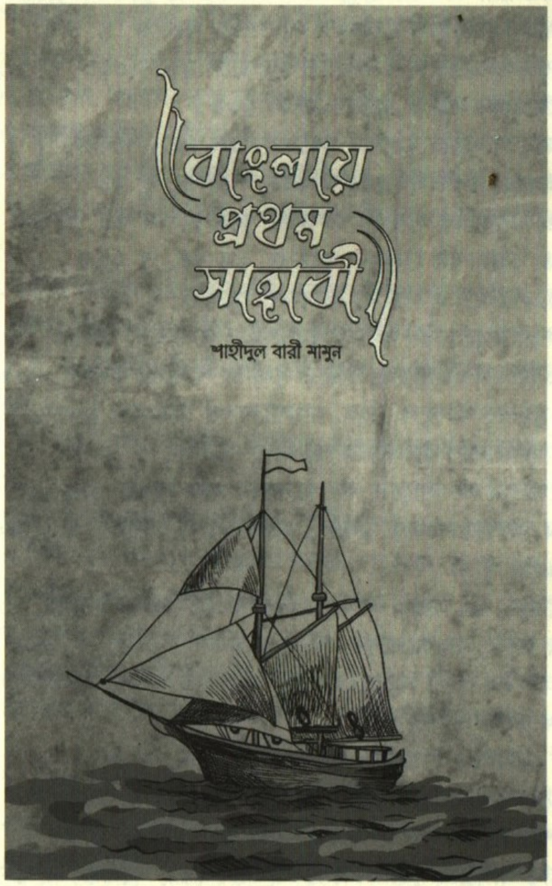
(২০) আল কোরআন, সুরা হজ ২২, আয়াত ৫৮

(২১) আল কোরআন, সুরা আন-নহল ১৬, আয়াত ১১০

(২২) এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার, প্রাক ইসলামি আরবদের ইতিহাস, ২০২২, পৃ. ৮৭

(২৩) মওলানা ইউসুফ কান্ধলভী (র), হায়াতুস সাহাবা, দেওবন্দ, ১৯৮৬, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫৪২
(২৪) শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪
(২৫) গোলাম আহমদ মোর্তজা, ইতিহাসের ইতিহাস, কোলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৩১
(২৬) জিল্লুর রহমান হাশেমী, রসুলের (স) বাণীতে হিন্দুস্থান, ২০১৫, পৃ. ১৩
(২৭) বাল্মীকী, রামায়ন, অনুবাদ- রাজ শেখর বসু, ২০১৬, পৃ. ৩৬ (হুবহু নেয়া হয়েছে)
(২৮) সুনানে নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ৩১৭৬
(২৯) গোলাম আহমদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস, কোলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৫
(৩০) (ক) আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০, পৃ. ৬৭
(খ) গোলাম আহমদ মোর্তজা, ইতিহাসের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
(৩১) (ক) গোলাম আহমদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
(খ) ড. মোহাম্মদ ইনাম-উল হক, ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, ২০০৩, পৃ. ২৬
(গ) এ. কে. এস. আবদুল আলীম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, ১৯৬৯, পৃ. ১১
(৩২) (ক) এ. কে. এস. আবদুল আলীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬
(খ) এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ.পৃ. ১৪১
(৩৩) বোখারী শরীফ, হাদিস নম্বর ৩৫৮৮
(৩৪) পূর্বোক্ত, হাদিস নম্বর-৩৫৮৯
(৩৫) মুস্তাদরারে হাকেম, হাদিস নং-৭০১৯
(৩৬) ড. মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রসুলের জীবন কথা- ১৯৯৪, ২য় খন্ড, পৃ. ১৭৬
(৩৭) (ক) টি. ডব্লিউ.আর্নল্ড, দি প্রিচিং অব ইসলাম, লন্ডন, ১৮৯৬, পৃ. ৯১
(খ) মনযূর আহমদ, সিন্ধু থেকে বঙ্গ, ১ম খন্ড ২০২১, পৃ. ২০৫
(৩৮) (ক) মওলানা আকরাম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ২০০২, পৃ. ৬১
(খ) মনযূর আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড ২০২১, পৃ. ৪৫
(৩৯) ভারতবর্ষ ও ইসলাম, কোলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১১৮
(৪০) ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন, ২০১৯, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬৩
(৪১) সুরজিৎ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
(৪২) টি. ডব্লিউ.আর্নল্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫
(৪৩) পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮

(৪৪) (ক) এ. কে. এম নাজির আহমেদ, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, ১৯৯৯, পৃ. ২১
(খ) ড. মোহাম্মদ হান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
(৪৫) (ক) মওলানা আকবর শাহ্? খান নজিবাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯
(খ) শাইখ মোহাম্মদ ইসমাইল পানিপথী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
(গ) সাদিক ফারহান, ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ, ২০২০, পৃ. ১৩৩
(৪৬) (ক) মেশকাত শরীফ, হাদিস নম্বর- ৫৮৮১
(খ) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৮
(৪৭) (ক) বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
(খ) ড. মোহাম্মদ হাননান আগমন, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৮৯
(৪৮) (ক) ড. মোহাম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৪
(খ) বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
(৪৯) (ক) গোলাম হোসায়ন সলীম, রিয়াজ-উস-সালাতীন, মালদহ, ১৭৮৮, পৃ. ৩৫
(খ) এ বি এম হাবিবুল্লাহ, ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ, ২০০৪, পৃ. ৪৯
(৫০) (ক) মুহম্মদ আবদুল রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৭৭, পৃ. ৬২
(খ) বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
(৫১) (ক) গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সুফি সাধক, ১৯৮০,পৃ. ১৮
(খ) গোলাম আশরাফ খান উজ্জল, বাংলাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ১০০ মসজিদ, ২০২১, পৃ. ৯
(গ) চঞ্চল মাহমুদ, ৬৯ হিজরী সনের মসজিদ ও বাংলাদেশে ইসলাম, ২০১৮, পৃ. ৩০
(ঘ) জিলহজ আলী, বাংলাদেশের প্রাচীন মাসজিদ, ২০০৫, পৃ. ১৪২
(ঙ) জনাব আইউব আলী সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে কথপোকথন।
(৫২) প্রত্যক্ষ দর্শনে বর্ণিত।
(৫৩) শাইখ মোহাম্মদ ইসমাইল পানিপথী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০
(৫৪) ড. মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১০৩
(৫৫) (ক) শাইখ মোহাম্মদ ইসমাইল পানিপথী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
(খ)আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫
(৫৬) প্রত্যক্ষ দর্শনে বর্ণিত।
(৫৭) রিচার্ড এম. ইটন, ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮, পৃ. ৯৪
(৫৮) গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ৩৮
(৫৯) ড. মোহাম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬



বাংলায় প্রথম সাহাবী এবং একটি বিভ্রান্তির অবসান

বাংলায় আগত প্রথম সাহাবীর নাম নিয়ে রয়েছে যথেষ্ঠ বিভ্রান্তি। চীন ও বাংলাদেশের কিছু ইতিহাসবিদদের মতে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বাংলায় আগত প্রথম সাহাবী এবং তাঁর মাজার রয়েছে চীনের ক্যান্টনে; কিন্তু প্রকৃত সত্য তিনি কখনো বাংলায় আসেননি। এসেছিলেন তাঁর বাবা আবূ ওয়াক্কাস মালেক ইবনে ওহাইব (রা) এবং চীনের ক্যান্টনে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) নয় তাঁর বাবা আবূ ওয়াক্কাস মালেক ইবনে ওহাইবের (রা) মাজার রয়েছে। চীন এবং বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের ইতিহাসে এই দুটি নাম নিয়েই যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে, যার কারণে প্রকৃত সত্য জানার জন্য সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) এবং তাঁর বাবা আবূ ওয়াক্কাস মালেক ইবনে ওহাইবের (রা) জীবন ও কর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বনূ জোহুরা গোত্রের আবূ ওয়াক্কাস মালেক ইবনে ওহাইব (রা) নবুয়্যাতের ৫ম বর্ষে মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরের বছর নবুয়্যাতের ৬ষ্ঠ বর্ষে তিনি আবিসিয়ার বাদশা নাজ্জাশির উপহার দেয়া জাহাজে করে চীনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান, লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেশে দেশে ধর্ম প্রচার। তিনি মালাবার হয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং বাংলাদেশ থেকে ৩ হিজরি চীনের ক্যান্টন বন্দরে পৌঁছান। সেখান তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন যা আবূ ওয়াক্কাস মসজিদ নামে পরিচিত। আবূ ওয়াক্কাস মালেক ইবনে ওহাইবের (রা) ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে শুধুমাত্র এটুকু তথ্য পাওয়া যায়। যেহেতু তিনি অনেক আগে হিজরত করেছেন এবং হিজরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন যার কারণে আরবের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর হিজরতকালীন সময়ের তেমন কোন তথ্য নেই; এছাড়া তাঁর বর্ণিত কোন হাদিসও পাওয়া যায় না। এক কথায় তিনি ইসলামের ইতিহাসে খুব একটা পরিচিত সাহাবী নন।

অপরদিকে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন নিজ গুণে অনন্য একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী, তাঁর কিছু দূর্লভ বৈশিষ্টের কারণে তিনি ইসলামের ইতিহাসে অতি পরিচিত এবং সম্মানিত একজন ব্যক্তি। তাঁর কর্মময় ঘটনাবহুল জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলো বিভিন্ন হাদিস এবং প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি নিজেও ২৭০ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১] কিন্তু কোথাও বাংলায় আগমনের তথ্য বা হাদিস পাওয়া যায় না।

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সম্পর্কে ছিলেন রসুলের (স) গোত্রীয় মামা। ঐতিহাসিকদের অনেকে মনে করেন সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন রসুলের

(স) মা আমিনার চাচাতো ভাই, বিষয়টি আসলে এরকম নয়। মা আমিনার দাদার নাম ছিল আবদে মানাফ এবং তাঁর দুই ছেলের নাম ওহাব এবং ওহাইব। মা আমিনার পূর্ণ নাম আমিনা বিনতে ওহাব ইবনে আবদে মানাফ অর্থাৎ ওহাব ছিলেন মা আমিনার বাবা। অপরদিকে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) পূর্ণ নাম ছিল সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস মালেক ইবনে ওহাইব ইবনে আবদে মানাফ অর্থাৎ ওহাইব ছিলেন সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) দাদা। সেই হিসেবে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হলেন মা আমিনার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে, চাচাতো ভাই নয়; কিন্তু, রসুলের (স) আপন কোন মামা ছিল না, ছিল ইয়াগূস ও উবাইদে ইয়াগূস নামে দুজন সৎ মামা। মা আমিনা বনূ জোহুরা গোত্রের হওয়ায় ঐ গোত্রের লোকেরা বলতেন আমরা রসুলের (স) মামা। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) জোহুরা গোত্রের হওয়ায় রসুল (স) তাঁকে মামা বলেই সম্বোধন করতেন যদিও তিনি ছিলেন রসুলের (স) মামাতো ভাই।[২]

ইমাম তিরমিযী (র) একই মত পোষণ করে বলেছেন, "সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) জোহুরা গোত্রের লোক ছিলেন এবং রসুলের (স) মা আমিনাও ছিলেন জোহুরা গোত্রের। এই হিসেবে রসুল (স) বলেছেন সাদ (রা) আমার মামা।" সম্পর্কে যা হোক সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসকে (রা) রসুল (স) নিজ মামার মতোই ভালবাসতেন এবং আস্থা রাখতেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হজরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদিসে পাওয়া যায়, তিনি বলেছেন- "একদা সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) রসুলের (স) সামনে উপস্থিত হলেন। তখন রসূল (স) বললেন, ইনি হলেন আমার মামা। কারো এরূপ মামা থাকলে সে আমাকে দেখাক।"[৩]

ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থায় যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর এবং আল্লামা ইস্পাহানীর মতে সে সময় তাঁর দাঁড়ী গোঁফ গজায়নি।[৪] খুব কম বয়সের ইসলাম গ্রহণ করায় রসুল (স) তাঁকে সম্মানের উচ্চ আসনে বসিয়েছিলেন।

রসুল (স) নবুয়্যাত লাভের পর শুধুমাত্র কাছের লোকদের খুব গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, সে সময়ে হজরত আবূ বক্করের (রা) দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হলেন সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা)। এ বিষয় সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে পাওয়া যায়- "আমি আমাকে

এ অবস্থায় দেখেছি যে, আমি ছিলাম ইসলামের তৃতীয় ব্যক্তি। আমি সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছি, যখন দুজন ব্যতিত আর কেউই ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং সাত দিন পর্যন্ত আমি ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে ছিলাম।"[৫]

তবে ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেন তিনি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় নন সপ্তম ব্যক্তি। ইমাম বুখারির (র) মতে ইসলামের তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বোঝাতে চেয়েছেন রসুলের (স) সাথে যারা ইসলাম এনেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে তৃতীয়।[৬] তবে তিনি প্রথম সাতজনের একজন এ নিয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ইসলাম গ্রহণের পর পুরো বিষয়টি গোপন রাখেন এবং নবুয়্যাতের চতুর্থ বর্ষে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু হলে তিনি তখন ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে সবার আগে বাধা হয়ে দাঁড়ান তাঁর মা হামনা বিনতে সুফিয়ান (রা)। তিনি তাঁর পুত্রের ধর্ম পরিবর্তনের সংবাদে বিলাপ শুরু করেন এবং ঘোষনা দেন, "সাদ (রা) যতক্ষণ না ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে না আসছে, আমি কিছু খাব না বা পান করব না। এমনকি রোদ থেকে ছায়াতেও যাব না।" তিন দিন পর্যন্ত হামনা বিনতে সুফিয়ান (রা) তাঁর প্রতিজ্ঞায় অনড় থাকেন এবং এজন্য তাঁর অবস্থা খুবই করুন হয়ে যায়। সাদ (রা) নিজেও অস্থির হয়ে যান এবং রসুলের (স) কাছে এসে তাঁর অস্থিরতার কথা জানান।

আল্লাহ তখনই আয়াত নাজিল করলেন- "আমি মানুষকে বাবা-মার সাথে সম্মানজনক আচরণ ও খেদমত করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু, তারা যদি আমার সাথে উপাস্য হিসেবে কোনকিছুকে শরিক করার জন্য চাপ দেয়, তবে তা কখনো মানবে না। কারণ তুমি জানো আল্লাহর কোন শরিক নেই। মনে রেখো, আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন দুনিয়ায় যা-কিছু করেছ, তাঁর ভালো-মন্দ তোমাদের পুরোপুরি বুঝিয়ে দেয়া হবে।"[৭] এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) অন্তর প্রশান্ত হয় এবং তিনি বাড়ি ফিরে তাঁর মাকে বলেন, "আপনার মতো হাজার মাও যদি আমাকে ইসলাম ত্যাগ করানোর জন্য জীবন বিসর্জন দেয়। তবুও এই সত্য ধর্ম ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" সাদের (রা) কথা তাঁর মায়ের অন্তর স্পর্শ করে এবং পরবর্তীতে তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৮]

শুধু এই আয়াতই নয় সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) কথা বা কাজের প্রক্ষিতে আল-কোরআনে মোট চারটি আয়াত নাজিল হয়েছে। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের

(রা) ছেলে মুসাব ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে পাওয়া যায়- "তিনি বলেন, আমার পিতার প্রসঙ্গে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।"[৯]

আরবের প্রচলিত রীতি অনুসারে কেউ করো প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাঁকে দোয়া করার জন্য বলে আমার মা তোমার জন্য উৎসর্গিত অথবা আমার বাবা তোমার জন্য উৎসর্গিত। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) একমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, রসুল (স) তাঁর মা-বাবা উভই যার জন্য উৎসর্গিত বলে দোয়া করছেন। হজরত আলী (রা) বলেন, "রসুল (স) তাঁর পিতা মাতাকে একত্রে কুরবান হবার কথা সাদ (রা) ছাড়া আর কারো জন্য বলেননি। তিনি ওহুদের দিন সাদকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বীর যুবক! তীর নিক্ষেপ কর। আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত।"[১০]

এছাড়া রসুল (স) একবার সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) জন্য দোয়া করেছিলেন যেন তাঁর সব দোয়া আল্লাহ কবুল করেন। রসুলের (স) দোয়ার কারণে আল্লাহ সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) কে মুসতাজাবুদ দাওয়া বানিয়ে দেন। এজন্য তিনি যা দোয়া করতেন আল্লাহ তাই কবুল করতেন।[১১] এ প্রসঙ্গে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, "রসুল (স) দোয়া করলেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি সাদের দোয়া কবুল কর- যখনই সে দোয়া করে।"[১২]

হিজরতের পূর্বে মোশরেকদের অত্যাচারে যখন মুসলমানরা গোপনে ইবাদত করতো তখন মোশরেকরা সুযোগ পেলেই নও মুসলিমদের উপর আক্রমন করে বসতো। কয়েকজন নও মুসলিম গোপনে ইবাদতের সময় কয়েকজন মোশরেক তাঁদের ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা বিদরূপ করতে থকলে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারেননি। তিনি একটি উটের হাঁড় দিয়ে এক পৌত্তলিকের মাথায় আঘাত করেন, এতে তার মাথা থেকে রক্তপাত হয়। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে মুসলিমদের প্রতিরোধের জন্য প্রথম রক্তপাত।[১৩]
শুধু তাই নয় ইসলামের জন্য প্রথম তীরটিও নিক্ষেপ করেছিলেন সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা)। হিজরতের পরের বছর রসুল (স) ষাট জনের একটি দলকে মদিনার উপত্যকায় কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য পাঠান। ইকরিমা ইবনে আবূ জেহেল (রা) তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। তিনি কুরাইশদের একটি টহলদল নিয়ে যাওয়া সময় মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হন। উভয় দলই সংঘাত এড়িয়ে গেলেও কুরাইশদের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করলে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাকে তীর নিক্ষেপ করেন। এটিই হচ্ছে ইসলামের জন্য প্রথম তীর নিক্ষেপের ঘটনা এবং সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হলেন ইসলামের জন্য

প্রথম তীর নিক্ষেপকারী।[১৪] এ প্রসঙ্গে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, "ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আমিই শত্রুদের প্রতি সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি।"[১৫]

২ হিজরি সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) তীর নিক্ষেপের সেই ঘটনা থেকেই ধর্মের জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ শুরু হয়। এরপর তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুসংখ্যক অভিযান পরিচালনা করেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তাঁর বীরত্ব এবং সাহসিকতার কারণে তিনি হয়ে ওঠেন ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ তিনজন সেনাপতির একজন। সর্বাধিক অভিযানে জয়ী খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) এর পরেই তাঁর অবস্থান।

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় তিনি আশারে মুবাশশারা অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া দশজন ব্যক্তিদের একজন। তিনি জীবিত অবস্থায় আল্লাহর ক্ষমা এবং জান্নাতের নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন। আশারে মুবাশশারাদের বিষয়ে রসুলের (স) বরাত দিয়ে হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেছেন- "নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন, আবুবকর (রা), ওমর (রা), ওসমান (রা), আলী (রা), তালহা (রা), যোবায়ের (রা), আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা), সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা), সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) এবং আবু ওবায়দা জাররাহ (রা) জান্নাতে যাবে।"[১৬] একই হাদিস বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) যা তিরমিযী শরিফে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১৭]
মক্কার পৌত্তলিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন সাহাবীরা মক্কা ত্যাগ করছিলেন সে সময় সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাঁর ভাই উমাইর ইবনে আবূ ওয়াক্কাসকে (রা) সাথে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় গিয়ে তাঁরা তাঁদের আরেক ভাই উতবা ইবনে আবূ ওয়াক্কাস এর কাছে আশ্রয় নেন।[১৮] তিনি ছিলেন ইসলামের প্রাথমিক সময়ে হিজরতকারীদের একজন।
১০ হিজরি বিদায় হজের সময় একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। বিদায় হজে মক্কায় এসে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) অত্যান্ত অসুস্থ হলে রসুল (স) তাকে দেখতে যান। ঐ সময় সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সংশয় প্রকাশ করেন যদি তার মৃত্যু মক্কায় হয় তাহলে তার হিজরত অবস্থায় মৃত্যু হবে না। রসুল (সা) তখন সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) শারিরিক সুস্থতা এবং হিজরতের স্থানে ওফাতের দোয়া করেন। এ ঘটনাটি একাধিক হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "বিদায় হজে আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে, আল্লাহর রসুল (স) আমার খোঁজ নেয়ার জন্য আসতেন।

একদা আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ নেই আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে কি আমি আমার সম্পদের দু' তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার নিবেদন করলাম তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ। তোমার ওয়ারিশদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাঁদের খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় দেয়া হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল (স) আমি কি আমার সাথীদের থেকে পিছিয়ে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক আমল করতে থাকো, তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কওম উপকৃত হবে। তা না হলে তুমি পেছনেই থেকে যাবে এবং অন্যরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। হে আল্লাহ! আমার সাথীদের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দেবেন না। কিন্তু আফসোস! সাদ ইবনে খাওলার জন্য। রসুল (স) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন, যেহেতু তাঁর তিনি মক্কায় ইন্তেকাল করেছিলেন।"[১৯]

এই হাদিস মোতাবেক সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) শারিরিক সুস্থতা, দানের ক্ষেত্রে তার উদারতা এবং তাঁর সন্তানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রসুল (স) দোয়া করেছেন। এই ঘটনার পর তিনি আরও ৪৫ বছর বেঁচে ছিলেন। এছাড়া তাঁর বেশ কয়েক জন সন্তান হয় এবং হিজরতের স্থান মদিনায় ওফাত হয়।[২০]

৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পার্সিকদের বিরুদ্ধে কাদিসিয়ার যুদ্ধে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) যুদ্ধের সেনাপতির ভূমিকা পালন করেন। কাদিসিয়া বিজয়ের পর খলিফা হজরত ওমর (রা) এর নির্দেশক্রমে সেনাপতি সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) মাদায়েন বিজয় করেন ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। একই বছর সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) অনুমতিক্রমে কাকা বিন আমর (রা) জালালুর প্রান্তরে আট দিন অবরোধের পর হুওলোয়ান বিজয় করেন। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সমগ্র ইরাক মুসলিমদের অধিকৃত হয়।

মাদায়েনে কিছুদিন থাকার পরেই সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বুঝতে পারেন এখানকার আবহাওয়া আরব সৈন্যদের জন্য বসবাসের উপযোগী নয়। এখানে থাকার কারণে সৈন্যদের গায়ের রং পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। তিনি বিষয়টি ওমর (রা) কে জানিয়ে সামাধান চাইলে ওমর (রা) নির্দেশনা পাঠান আরব

সীমান্তের খুব কাছাকাছি নতুন একটি শহর প্রতিষ্ঠিত করে সেখানে প্রদেশের রাজধানী স্থানান্তর করতে। এই নির্দেশনা মোতাবেক সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করে কুফা নামকরণ করেন এবং হিরার অর্থাৎ ইরাকের নতুন রাজধানী সেখানে নিয়ে যান। তিনি শহরের মাঝখানে একটি বৃহৎ মসজিদ স্থাপন করেন যেখানে চল্লিশ হাজার মানুষ এক সাথে নামাজ আদায় করতে পারে। ওমর (রা) পত্রমাধ্যমে তাঁকে সেনাপতি থেকে ইরাকের গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান করেন।

তিনি সেখান থেকে পারস্য অভিযানের প্রস্তুতি নিলে জাররা ইবনে সেনানের সাথে মতানৈক্য তৈরি হয়। জাররা ইবনে সেনানের কিছু সহযোগী মদিনায় গিয়ে ওমর (রা) কে অভিযোগ করেন যে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) অন্যান্য কাজতো বটেই এমনকি নামাজের ইমামতিতেও যথেষ্ঠ উদাসীন। ওমর (রা) এই অভিযোগ মোটেও গুরুত্বের সাথে নেননি; কিন্তু সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসকে (রা) সমালোচনার উর্ধে রাখার জন্য তিনি মোহাম্মদ ইবনে মোসলেমাকে (রা) তদন্তের জন্য কুফায় পাঠান। মোহাম্মদ ইবনে মোসলেমা (রা) কুফার প্রতিটি মসজিদে গিয়ে মুসল্লিদের সাথে কথা বলে অভিযোগের কোন সত্যতা পাননি। যার কারণে তিনি সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) এবং অভিযোগকারী উভয়কে নিয়েই আবারো মদিনায় ফেরত আসেন। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমানিত হওয়ার পরেও ওমর (রা) তাঁকে কুফার গভর্নরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং মদিনায় অবস্থন করতে নির্দেশ দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসকে (রা) আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব দেয়া। তেইশ হিজরি ওমর (রা) অগ্নিউপাসক আবূ লূলু কর্তৃক গুরুতর আহত হলে মুমূর্ষ অবস্থায় পরবর্তী খলিফা হিসেবে ছয়জনের নাম প্রস্তাব করেন; এই ছয় জনের মধ্যে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন। সর্বসম্মতি ক্রমে ওসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হলে তিনি সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) কে আবারো কুফার গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান করেন; কিন্তু ২৬ হিজরি কুফার অর্থমন্ত্রী আবুল্লাহ ইবনে মাসুদের (রা) সাথে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) মতপার্থক্য তৈরি হলে ওসমান (রা) তাঁকে কুফার গভর্নরের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেন এবং আমির মোয়াবিয়াকে (রা) গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এটিই ছিল সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) রাষ্ট্রীয় কাজের শেষ দায়িত্ব। তিনি মদিনায় ফিরে এসে নিজেকে কোন রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেননি।[২১]

৩৫ হিজরি হজরত ওসমানকে (রা) যখন বিদ্রোহীরা হত্যা করে তখন তিনিই

ছিলেন বিদ্রোহীদের প্রথম প্রতিরোধকারী। বেশ কিছু সাহাবীদের নিয়ে তিনি বিদ্রোহীদের দমন করে উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওসমানের (রা) উদারতা এবং কোমলনীতির কারণে বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সামর্থ থাকার পরেও সাহাবীরা তা করতে পারেনি। হজরত ওসমান (রা) শহীদ হওয়ার পর হজরত ওসমানের (রা) হত্যার বিচার নিয়ে হজরত আলী (রা) এবং আমির মোয়াবিয়ার (রা) মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। হজরত আলী (রা) এবং আমির মোয়াবিয়ার (রা) উভয়ই অত্যান্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিল। ইবনে ওমর (রা) বলেন, "হিজরতের পর রসূল (স) সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করলেন। হজরত আলী (রা) অশ্রুসিক্ত নয়নে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি সবাইকে ভ্রাতিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন, অথচ আমাকে করেননি। রসূল (স) বললেন, দুনিয়া ও আখিরাতে তুমি আমারই ভাই।"[২২] অপরদিকে হজরত আমির মোয়াবিয়া (রা) বিশেষ দোয়া পেয়েছেন রসুলের (স) কাছে থেকে। রসুল (স) বলেছেন, "আল্লাহ! তুমি মোয়াবিয়ার (রা) দ্বারা লোকদের পথ প্রদর্শন করো।"[২৩]

যেহেতু দুজনই প্রসিদ্ধ এবং মর্যাদাবান সাহাবী এবং হজরত ওসমান (রা) হত্যার বিচার নিয়ে দুজনের কেউই একমত হতে পারেননি তাই নীতিগত কারনেই মুসলিম উম্মাহ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং নতুন নতুন মতবাদের সৃষ্টি হয়। মুসলিম উম্মার এই বিভক্তি প্রবীণ সাহাবীরা মেনে নিতে পারেননি। যার কারণে একাধিক প্রবীণ সাহাবী রাজনীতি এবং সরকারি কাজকর্ম থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেন। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি সরকারি কাজকর্ম এমনকি লোকালয় থেকেও নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। এই ঘটনার পর তিনি মদিনা থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে আকিক উপত্যকায় বসবাস করা শুরু করেন। এমনকি তিনি উটের যুদ্ধ এবং সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।[২৪]

এই সময় খিলাফত নিয়েও মুসলিম উম্মার মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। হজরত আলী (রা) এবং আমির মোয়াবিয়া (রা) উভয়ই খলিফা হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ায় সাহাবীরাও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পরেন; কিন্তু সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) কারো পক্ষই গ্রহণ করেননি বরং পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর ছেলে উমর বিন সাদ তার পিতাকে বলেন, "মদিনায় খেলাফত এবং ক্ষমতার জন্য লড়াই চলছে আর আপনি এখানে একা বসে আছেন?"

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, "বেটা আমি রসুল (স) কে বলতে শুনেছি আল্লাহতালা সেই বান্দাকে পছন্দ করেন যে মানুষের মুখাপেক্ষী নয়, মানুষ যার পরিচয় জানে না এবং যে একজন খোদাভীরু।"[২৫]

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ৩৫ থেকে ৫৫ হিজরি অর্থাৎ জীবনের শেষ ২০ বছর মদিনার জনবসতি থেকে দূরে আকিক উপত্যকায় বসবাস করেছেন এবং ইবাদতে আত্মনিমগ্ন থেকেছেন। তাঁর ওফাতও হয়েছে নিজ বাসগৃহে, পরিবারের সান্নিধ্যে। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) ওফাতের সময়ের ঘটনা নিয়ে তাঁর ছেলে মোসাব বিন সাদ বলেছেন, আমার পিতার অন্তিম সময়ে তার মাথাটি আমার কোলের উপর ছিল। তার মুমূর্ষ অবস্থা দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বেটা কাঁদছো কেন?"

আমি বললাম,"আপনার এ অবস্থা দেখে।"

তিনি বললেন,"আমার জন্য কেঁদো না। আল্লাহ কখনো আমাকে শাস্তি দেবেন না, আমি জান্নাতবাসী। আল্লাহ মুমিনদেরকে তার সৎকাজের প্রতিদান দেবেন, কাফিরদের সৎ কাজের বিনিময়ে তাদের শাস্তি লাঘব করবেন।"[২৬]

এরপর তিনি মদিনা শহর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে আকিক উপত্যকায় নিজ বাড়িতে ৫৫ হিজরিতে ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[২৭] তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে উম্মুল মুমেনিন হজরত আয়েশা (রা) তাঁর লাশ মদিনায় এনে মসজিদে জানাযা করতে বলেন যেন নবী পত্নীগণ তার জানাযায় শরিক হতে পারেন। হজরত আয়েশার (রা) কথা মতো সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) জানাযা মসজিদে পড়ানো হয়। পরবর্তীতে তাঁর কাছে সংবাদ পৌছে মসজিদে জানাযা পড়ানোর কারনে কেউ কেউ নিন্দা গাইছে। হজরত আয়েশার (রা) কানে এ সংবাদ আসলে তিনি বলেন, "মানুষ সে বিষয়ে কেন নিন্দা গায়, যে বিষয়ে তাদের মোটেও কোন জ্ঞান নেই। এতো তাড়াতাড়ি তারা ভুলে গেল আল্লাহর রসুল (স) সুহাইল বিন বাইয়া ও তার ভাইয়ের জানাযা মাসজিদের ভিতরেই পরেছিলেন।"[২৮]

মদিনার তৎকালীন গভর্ণর মারওয়ান ইবনে হাকাম সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) জানাযা পড়ান।[২৯] জানাযা শেষে তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয় এবং তিনিই ছিলেন আশারে মুবাশশারাদের মধ্যে সবার শেষে মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তি।[৩০]

শুধু তাই নয় সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) মারা যাওয়ার সময় অসিয়ত

করেছিলেন তাকে কবর দেয়ার সময় যেন বদর যুদ্ধে অংশ নেয়ার সময় পরিহিত জামাটি দিয়ে দাফন করানো হয়। তার অসিয়ত মোতাবেক বদর যুদ্ধে পরিহিত জামাটি পরিয়ে তাকে দাফন করা হয়।[৩১]

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) বীরত্বপূর্ণ জীবনের উল্লেখ্য যোগ্য ঘটনার পরিমাণ এতো বেশি যা উল্লেখ করতে গেলে একটি আলাদা গ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ৩৫ হিজরি হজরত ওসমান (রা) শহীদ হওয়া পর্যন্ত তিনি কখনও সাধারণ সৈনিক, কখনও সেনাপতি, কখনও গভর্নরের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর কর্মময় জীবনী থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) জীবনের শেষ ২০ বছর, ওফাত, জানাযা এবং দাফন মদিনাতেই ছিল। চীনে ক্যান্টনে তাঁর মাজার হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) প্রাচীন এবং নির্ভরযোগ্য জীবনীতে তাঁর বাংলাদেশে আগমন অথবা চীন সফরের কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তাঁর উৎস হচ্ছে চীনে লিখিত ইতিহাস; এছাড়া বাংলাদেশে যারা বলেন সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বাংলাদেশে এসেছিলেন তাঁরা মূলত ঐ চীনে লিখিত ইতিহাসের বরাত দিয়েই বলেন।

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) চীনে আগমনের ১ম ধারণা অনুসারে তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ৬১৭ থেকে ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করেছে এরপর ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩ হিজরি তারা চীনে পৌঁছায়।

ইসলামের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২ হিজরি অর্থাৎ ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে। বদর প্রান্তরে হওয়ার কারণে একে বলা হয় বদর যুদ্ধ। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) এবং তার ভাই উমাইর বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বদর যুদ্ধে আংশগ্রহণ করেছিলেন এবং উমাইর বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বদর যুদ্ধে শহিদ হন। তথ্যসূত্র হিসেবে ইবনে ইসহাকের সীরাতে রাসুলুল্লাহ (স) এবং ইবনে হিসামের সীরাতুন নবী (স) গ্রন্থ দুটি অত্যান্ত প্রাচীন এবং নির্ভরযোগ্য। এই দুই গ্রন্থে বদরযুদ্ধে অংশ নেয়া সকল সাহাবীর নামের তালিকা উল্লেখ পাওয়া যায়। ইবনে ইসহাকের সীরাতে রাসুলুল্লাহ (স) গ্রন্থ এযাবতকালে লেখা সকল সিরাত গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন যা রসূলের (সা) ওফাতের ১২০ বছররে মধ্যে এটি লেখা হয়। যার কারণে নিশ্চিতভাবে বলা যায় এখন পর্যন্ত বাংলায় ইসলামের আগমন নিয়ে যতো বই লেখা হয়েছে তাদের যে কোনটির চেয়ে ইবনে ইসহাকের সীরাতে রাসুলুল্লাহ (সা) গ্রন্থ অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) তথ্যের ব্যাপারে।

বদর যুদ্ধের পরের বছর ৩ হিজরি অর্থাৎ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে ওহুদ প্রান্তরে অনুষ্ঠিত ওহুদ যুদ্ধে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সাহসিকাতার কারণে তিনি রসুলের (স) দোয়া পেয়েছেন এবং যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়।[৩২]

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ২ এবং ৩ হিজরি মদিনায় বদর ও ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ কয়েছিলেন এবং ঐসময় বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

চীনের ইতিহাসে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) চীনে আগমনের ২য় ধারণা মতে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তার তিন জন সাথী হজরত সুহেলো আবু আরজা (রা), হজরত ইউওয়াইজ করনি (রা) এবং হজরত হাসান ইবনে থাবিত (রা) কে নিয়ে চীনে পাড়ি দেন। ফিরতি পথে তারা 'ইউনান-মণিপুর-চট্টগ্রাম' রুট হয়ে চট্টগ্রাম আসেন। পরে চট্টগ্রাম থেকে জাহাজযোগে আরবে যান।[৩৩]

হজরত ওমরের (রা) খিলাফতের শুরু থেকে সাহাবীদের মিশন হয় পারস্য বিজয়। আর এজন্য সাসানিদের বিপক্ষে একের পর এক যুদ্ধ চলতে থাকে। পারস্য বিজয় অভিযানগুলোতে চার জন সেনপতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন তাঁদের মধ্যে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) অন্যতম। ঐ সময়ের বীর সেনাপতি সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) কে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরিয়ে চীনে প্রেরণ করা হয়েছে এরুপ কিছু ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর চীনে যাওয়ার ঘটনা চীনের অনুমান নির্ভর ইতিহাসে থাকতে পারে বাস্তবে তা হওয়ার সম্ভব নয়।

তাঁর চীনে আগমনের ৩য় ধারণা থেকে জানা যায়, ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রা) হজরত সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসকে (রা) ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে চীনে তাং রাজবংশের কাছে ইসলামের বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করেন। ঐ বছর সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) চীনে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর স্মৃতিস্মারক হিসেবে ঐ মসজিদের নাম রাখা হয় 'হুইসাং মসজিদ'।[৩৪]

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) জীবনী থেকে জানা যায় ৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রা) তাঁকে কুফার গভর্ণর থেকে প্রত্যাহার করেন। এরপর থেকে তিনি আর সারকারি কাজে নিজেকে যুক্ত করেননি। ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৫ হিজরি যখন বিদ্রোহীরা হজরত ওসমান (রা) কে অবরোধ করেছিল

তখন সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) মদিনাতে ছিলেন এবং তিনি কিছু সাহাবী নিয়ে তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময় তিনি চীনে নয় মদিনাতেই অবস্থান করছিলেন।[৩৫]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরব-চীন পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম। বাংলায় সাহাবী আগমনের ক্ষেত্রে তাঁরা বাংলা হয়ে সমুদ্রপথে চীনে গেছেন অথবা চীন হয়ে স্থলপথে বাংলায় এসেছেন। বাংলায় সাহাবী আগমনকালে তাঁদের আগমনের ইতিহাস ঐ সময় লিখিত না হওয়ায় বাংলায় আগত অনেক সাহাবীর নামও হারিয়ে গেছে। যে কজনের নাম পাওয়া যায় তাও সংগ্রহ করা হয়েছে আরবদের লিখিত ভারতবর্ষে ও চীনে সাহাবী গমন অথবা চীনের লিখিত সাহাবী আগমন সংক্রান্ত ইতিহাস থেকে। হজরত মোহাম্মদের (স) ওফাত পরবর্তী খলিফা থেকে শুরু করে আমির মোয়াবিয়া (রা) এর জীবদ্দশা পর্যন্ত উল্লেখিত যারা বাংলায় এসেছিলেন সম্ভবত তাঁরা খলিফা কর্তৃক নির্দেশিত হয়েই এসেছিলেন; যার কারণে তাঁদের আগমনের ঘটনাগুলো আরবীয় ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁদের তালিকার কোথাও সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) নাম উল্লেখ নেই।

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) এবং তাঁর বাবা আবূ ওয়াক্কাস মালেক ইবনে ওহাইব (রা) এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে যা পাওয়া যায়-

বিষয়	সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা)	আবূ ওয়াক্কাস মালেক (রা)
পিতার নাম	আবূ ওয়াক্কাস মালেক (রা)	ওহাইব ইবনে আবদে মানাফ
পরিচিতি	ইতিহাসে বহুল পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ সাহাবী	ইতিহাসে খুব একটা পরিচিতি নেই
হিজরতের সময়	১ হিজরি	নবুয়্যতের ৫ম বর্ষ
হিজরতের স্থান	মদিনা	আবিসিনিয়া (বর্তমান ইরিত্রিয়া), মালাবার (বর্তমান কেরালা) সাতি-উল-গঙ্গা বন্দর (বর্তমান চট্টগ্রাম), চীনের ক্যান্টন বন্দর (বর্তমান কুয়াংচৌ বন্দর)
সফরসঙ্গী	ছোট ভাই উমাইর বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা)	কায়স ইবনে হুজাইফা (রা), উরওয়া ইবনে আসাসা (রা), আবু কায়স ইবনে হারিস (রা)
অবদান	হজরত মোহাম্মদ (স) থেকে হজরত ওসমান (রা) এর খিলাফত পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধের সেনাপাতি ও একাধিক বার কুফার গভর্ণর হিসেবে ভূমিকা পালন করেন	ইরিত্রিয়া, ভারতের কেরালা, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও রংপুর, চীনের ক্যান্টান বন্দরের অনেক মানুষকে ইসলামে দীক্ষীত করেন। চীনের প্রথম মসজিদ তিনি নির্মাণ করেন
মর্যাদা	আশারায়ে মুবাশশারার এক জন। (যারা ১০ জন জীবিত অবস্থায় বেহেস্তের সুসংবাদ পেয়েছেন)	ইসলামের প্রথম দিকের হিজরতকারী সাহাবী
বর্ণিত হাদিস	২৭০ টি	কোন হাদিস বর্ণিত হয়নি
মৃত্যু	৫৫ হিজরি, ৮৫ বছর বয়সে	মৃত্যু ও বয়স অজানা
মৃত্যুর স্থান	আকিক উপত্যাকা (মদিনা)	ক্যান্টন বন্দর (চীন)
মাজার	জান্নাতুল বাকী, মদিনা	ক্যান্টন বন্দর (চীন)

এখন প্রশ্ন হতে পারে চীনের ক্যান্টনে সাহাবীর মাজার বার বার ঘুরে ফিরে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) নাম আসে কেন?

এক্ষেত্রে যা হতে পারে-

যে সময় আবূ ওয়াক্কাস মালেক (রা) চীনে গিয়েছিলেন তখন ইসলামের প্রচার প্রসার ছিল খুব ক্ষীণ। ঐ সময়ের কোন ইতিহাসবিদ এই নতুন ধর্ম প্রচারকদের নাম ঠিকানা ইতিহাসে লেখার প্রয়োজন মনে করবে বলে মনে হয় না। এই কারণে চীনে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ইতিহাস লেখা হয়েছে অনেক পরে; তাই পরবর্তীতে ইতিহাস লেখার সময় নামটি সঠিকভাবে লেখা হয়নি।

সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) একজন বহুল পরিচিত সাহাবী এবং তাঁর পিতা আবূ ওয়াক্কাস মালেক (রা) ছেলের মতো পরিচিত নয়। হতে পারে এ কারণে চীনের ঐতিহাসিকরা বাবার নাম আর ছেলের নাম গুলিয়ে ফেলেছে।

আরবে প্রচীন রীতি অনুসারে বাবার নামের সাথে মিলিয়ে ছেলে মেয়েদের ডাকা হয়। চীনে এই ধারণা একেবারেই নতুন; যার কারণে বাবা ছেলে উভয়েরই নামের সাথে আবূ ওয়াক্কাস শব্দটি থাকায় চীনে ইসলামের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে বাবা ছেলের নাম এলোমেলো হয়ে থাকতে পারে।

নাম গুলিয়ে ফেলার একটা কারণ থাকতে পারে, চীনের ইতিহাসে হজরত ওসমানের (রা) সময় চীনে একজন আরবীয় সেনাপতি আগমনের কথা উল্লেখ পাওয়া যা, কিন্তু তাঁর না উল্লেখ নেই। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সেনাপতি হিসেবে খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করায় পরের প্রজন্মের ইতিহাসবিদ্গান নাম বিহীন সেনাপতির স্থানে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) নাম লিখে থাকতে পারেন।

আরেকটি কারণে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) নাম আসতে পারে, সেটি হচ্ছে ইন্টারনেট নির্ভর গবেষণা। ইন্টারনেটের কল্যানে খুব সহজেই অনেক তথ্য খুঁজে বের করা যায় কিন্তু তথ্যের শুদ্ধতা যাচাই করার কোন মাপকাঠি ইন্টারনেটে নেই। একজন একটি মতমত প্রদান করল সেটি ভুল না শুদ্ধ তা যাচাই ছাড়াই অনেকে এটিকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে; যার কারণে যে কোন ভুল তথ্যও খুব সহজে দ্রুত অন্যদের কাছে পৌছায়। এভাবে আবূ ওয়াক্কাসের (রা) নামের স্থলে সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) নাম লেখা হয়ে থাকতে পারে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, ইতিহাস ও বাস্তবতার জন্ম এক সাথে না হলেও কখনও তারা বিচ্ছিন্নভাবে সামনে এগোয় না, সব সময়ই পরস্পরকে প্রভাবিত করে। সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

তথ্যসূত্র-

(১) শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, হাদিস শরীফ বাংলা মর্মবাণী, ২০২১, পৃ. ৩৩১

(২) (ক) মওলানা ইসমাইল রেহান, মুসলিম উম্মার ইতিহাস, করাচী, ১৯৯০, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৪৫
(খ) সীরাত বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৭

(৩) (ক) মেশকাত শরীফ, হাদিস নম্বর ৫৮৬৭
(খ) তিরমিজি শরীফ, হাদিস নম্বর ৩৬৮৯

(৪) মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী, কাদেসিয়ার ঈগল সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাঃ জীবন ও কর্ম, ২০২০, পৃ. ১৫

(৫) (ক) মেশকাত শরীফ, হদিস নম্বর- ৫৮৬৯
(খ) বোখারী শরীফ, হদিস নম্বর ৩৪৫৬, ৩৪৫৭

(৬) মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

(৭) আল কোরআন, সুরা আনকাবুত ২৯, আয়াত ৮

(৮) ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ১৯৮৯, ১ম খন্ড, পৃ. ১০১

(৯) মুসলিম শরিফ, হাদিস নম্বর ৬০৮১

(১০) (ক) মেশকাত শরীফ, হাদিস নম্বর- ৫৮৫৩, ৫৮৬৬
(খ) তিরমিজি শরীফ, হাদিস নম্বর-৩৬৯০, ৩৬৯২
(গ) মুসলিম শরিফ, হাদিস নম্বর-৬০৭৫

(১১) মওলানা ইসমাইল রেহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৭

(১২) (ক) মেশকাত শরীফ, হাদিস নম্বর- ৫৮৬৪, ৫৮৬৫
(খ) তিরমিজি শরীফ, হাদিস নম্বর-৩৬৮৮

(১৩) (ক) ইবনে ইসহাক (র), সিরাতে রাসুলুল্লাহ (স), অনুবাদ- শহীদ আখন্দ, পৃ. ১৪৫
(খ) মুহাম্মদ আসগর কাসেমি, আশারা মুবাশশারা, ২০২২, পৃ. ৮০
(গ) মওলানা ইসমাইল রেহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৬

(১৪) ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

(১৫) মেশকাত শরীফ, হদিস নম্বর ৫৮৫৪, ৫৮৬৮

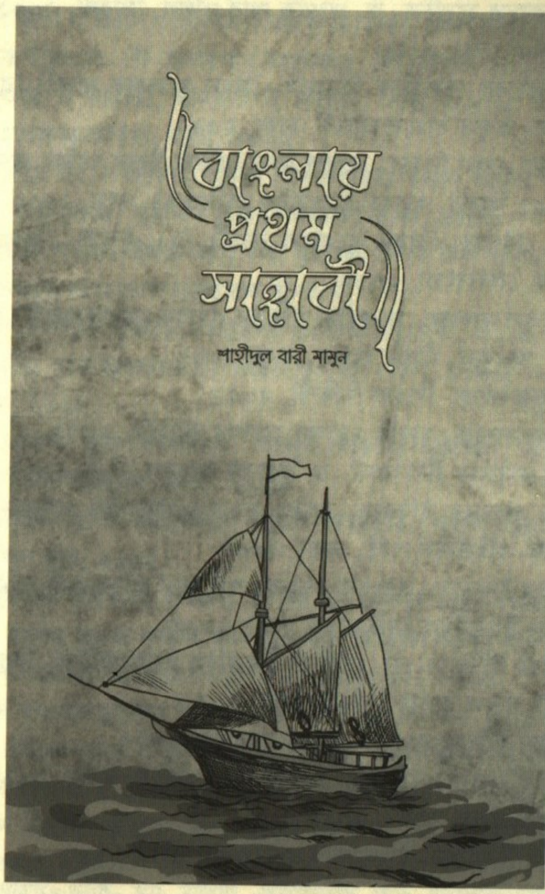
(১৬) মেশকাত শরীফ, হদিস নম্বর ৫৮৫৯

(১৭) তিরমিজি শরীফ, হাদিস নম্বর ৩৬৯৪

(১৮) ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

(১৯) (ক) বুখারি শরিফ, হাদিস নম্বর ১২৯৫
(খ) মুসনাদে আহমদ, হাদিস নম্বর ১৫৪৬
(গ) মুসলিম শরিফ, হাদিস নম্বর ১৬২৮

(২০) (ক) মওলানা ইসমাইল রেহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৭
(খ) ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫
(গ) মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী (র), হায়াতুস সাহাবা, ভারত, ১৯৮০, ৩য় খন্ড পৃ. ২৪৪
(২১) (ক) নিজাম সিদ্দিকী, আশারা মুবাশশারা- ২০০২, পৃ. ৭৯
(খ) মওলানা ইসমাইল রেহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৮
(গ) ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি, ইসলামের ইতিহাস, ১৯৬৯, পৃ. ১০৭
(২২) তিরমিজি শরিফ, হাদিস নম্বর ৩৬৫৮
(২৩) পূর্বোক্ত, হাদিস নম্বর-৩৭৭৯, ৩৭৮০
(২৪) (ক) মওলানা ইসমাইল রেহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৯
(খ) ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
(গ) নিজাম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১
(২৫) মুসলিম শরিফ, হাদিস নম্বর ৭৬২১
(২৬) ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
(২৭) (ক) মওলানা ইসমাইল রেহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫১
(খ) ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
(ঘ) মুফত মুহাম্মদ আসগর কাসেমি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
(২৮) (ক) মুসলিম শরিফ, হাদিস নম্বর ৯৭৩
(খ) তিরমিযী শরিফ, হাদিস নম্ব ১৫৪
(গ) নাসাঈ শরিফ, হাদিস নম্বর ১৭৯২
(২৯) ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
(৩০) মুফতি মুহাম্মদ আসগর কাসেমি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
(৩১) (ক) মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩
(খ) ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
(৩২) (ক) মওলানা ইসমাইল রেহান, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড পৃ. ৫৪
(খ) ইবনে ইসহাক, সীরাতে রাসুলুল্লাহ (স), পৃ. ৪১৬
(গ) ইবনে হিসাম, সীরাতুন নবী (স), ২য় খন্ড, পৃ. ৩৬৬
(ঘ) মওলানা আকবর শাহ্‌? খান নজিবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, ২০০৩, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৮
(৩৩) ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন, ১ম খন্ড, ২০১৯, পৃ. ২৬১
(৩৪) (ক) ইসলামের হারানো ইতিহাস- ফিরাস আল খাতিব, পৃ. ১৯২
(খ) ড. মোহাম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১
(৩৫) মওলানা ইসমাইল রেহান, পূর্বোক্ত, ৪র্থ খন্ড পৃ. ১৯৫



গ্রন্থপুঞ্জিঃ যাদের শ্রমের ফসল থেকে বীজ নিয়ে নতুন ফসল ফলিয়েছি

(১) আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী- শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, ২০১৪
(২) আল কোরানের মানচিত্র- ড. শাওকি আবু খলিল, সিরিয়া, ২০০১, অনুবাদ- এম রুহুল আমিন, ঢাকা, ২০২০
(৩) আল কোরানের ভৌগলিক ইতিহাস- সৈয়দ সুলেমান নাদভী (র), লখনৌ, ১৯১৭, অনুবাদ- অব্দুস সাওার আইনী, ঢাকা, ২০২২
(৪) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাসির আদ দামেশকী (র), ইরাক, ৭৫১ হিজরি, অনুবাদ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০০
(৫) আরবের নৌবহর- সৈয়দ সুলেমান নাদভী (র), মুম্বাই, ১৯৩১, অনুবাদ- হাবিব আহসান, কোলকাতা, ২০১৪
(৬) আর রাহীকুল মাখতূম- মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রা), ভারত, ১৩৯৬ হিজরি, অনুবাদ- মীযান হারুন, ঢাকা, ২০১০
(৭) আশারা মুবাশশারা- নিজাম সিদ্দিকী, ২০০২
(৮) আশারা মুবাশশারা- মুফতি মুহাম্মদ আসগর কাসেমি, ২০২২
(৯) আসহাবে রাসূলের জীবনকথা- ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ১৯৮৯
(১০) ইসলাম প্রচারের ইতিহাস- শাইখ মুহাম্মদ ইসমাইল পানিপথী, লাহোর, ১৯৬১, অনুবাদ- মহিউদ্দিন শামী, ঢাকা, ২০০৪
(১১) ইসলামের ইতিহাস- মওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী, করাচী, ১৩৪৩ হিজরি, অনুবাদ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৩
(১২) ইসলামের ইতিহাস- ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি, রিয়াদ, ১৯৬৯, অনুবাদ- কাজী আবুল কালাম সিদ্দিক, ঢাকা, ২০২০
(১৩) ইসলামের ইতিহাসের যুদ্ধ- সাদিক ফারহান, ২০২০
(১৪) ইসলামের হারানো ইতিহাস- ফিরাস আল খাতিব, মিশর, ২০১৪, অনুবাদ- আলী আহমাদ মাবরুর, ঢাকা , ২০১৯
(১৫) ইসলামী বিশ্বকোষ- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৬
(১৬) ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ- রিচার্ড এম. ইটন, যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৯০, অনুবাদ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৮
(১৭) ইতিহাসের ইতিহাস- গোলাম আহমদ মোর্তজা, কোলকাতা, ২০০৭
(১৮) কাদেসিয়ার ঈগল সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. : জীবন ও কর্ম- মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী, ২০২০,
(১৯) কল্কি অবতার আউর মুহাম্মদ সাহাব- ড. বেদপ্রকাশ উপাধান, এলাহাবাদ, ১৯৭০, অনুবাদ- জালালউদ্দিন বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১৯

(২০) চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য- আহসানুল হক, ২০১৪
(২১) চট্টগ্রামে ইসলাম- ড. আব্দুল করিম, ১৯৭০
(২২) চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস- সুনীতিভূষন কানুনগো, ২০১৮
(২৩) চেপে রাখা ইতিহাস- গোলাম আহমদ মোর্তজা, কোলকাতা, ১৯৮৬
(২৪) ঢাকার ইতিহাস- শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, কোলকাতা, ১৯১০
(২৫) তাবকাত ই নাসিরী, মীনহাজ ই সিরাজ, দিল্লি, ১২০৬, অনুবাদ- আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ঢাকা, ২০২২
(২৬) তাফসিরে ইবনে কাসির- আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাসির আদ দামেশকী (র), ইরাক, অনুবাদ-ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, ঢাকা, ১৯৮৬
(২৭) তিরমিজি শরীফ- ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী (র), অনুবাদ- মওলানা মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম,
(২৮) দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস- প্রফেসর মোহাম্মদ নূরনবী, ২০১৪
(২৯) দি প্রিচিং আব ইসলাম- টি. ডব্লিউ.আর্নল্ড, লন্ডন, ১৮৯৬, অনুবাদ- সিরাজ মান্নান, ঢাকা, ২০১২
(৩০) দ্য ব্যাটল অফ কাদিসিয়া, আব্দুল মালেক মুজাহিদ, রিয়াদ, ২০১৩, অনুবাদ- কায়সার আহমেদ, ঢাকা, ২০১৯
(৩১) দোয়াজদা সালা জাহাঙ্গিরী- সম্রাট জাহাঙ্গীর, লন্ডন, ১৮২৯, অনুবাদ- বোরহান উদ্দিন খান, ২০১৫
(৩২) প্রাক ইসলামি আরবদের ইতিহাস- এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার, ২০২২,
(৩৩) প্রাচীন বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম- ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রওশন আলী, ২০০৯
(৩৪) প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক ভূগোল- আবদুল গনী, ২০২১
(৩৫) প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন- ড. মোহাম্মদ হাননান, ২০১৯
(৩৬) প্রাচীন হরিকেল রাজ্য ও মধ্য চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত- সুনীতিভূষন কানুনগো, ২০১৬
(৩৭) প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি- ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ২০১৭
(৩৮) প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান- রায় বাহাদুর ডা. দীনেশচন্দ্র সেন, কোলকাতা, ১৯৪০
(৩৯) বোখারী শরীফ- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (র), বুখারা, ২৫৫ হিজরি, অনুবাদ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯
(৪০) বোখারী শরীফ- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (র), বুখারা, ২৫৫ হিজরি, অনুবাদ- শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক (র), ২০০৭
(৪১) বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন- ড. অতুল সুর, কোলকাতা, ১৯৮৬
(৪২) বাঙলার ইতিহাস- শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন, কোলকাতা, ১৯৪৯

(৪৩) বাঙালীর ইতিহাস- নীহাররঞ্জন রায়, কোলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ
(৪৪) বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন যুগ- সুনীতিভূষন কানুনগো, ১৯৯৪
(৪৫) বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, কে.এম.রাইছউদ্দিন খান, ১৯৮৬
(৪৬) বাংলাদেশে ইসলাম- আব্দুল মান্নান তালিব, ১৯৮০
(৪৭) বাংলাদেশে ইসলাম- এবনে সামাদ, ১৯৮৭
(৪৮) বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ- গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩
(৪৯) বাংলাদেশে ইসলামের আগমন- এ. কে. এম. নাজির আহমদ, ১৯৯৯
(৫০) বাংলাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ১০০ মসজিদ- গোলাম আশরাফ খান উজ্জল, ২০২১
(৫১) বাংলাদেশের প্রাচীন মসজিদ- জিলহজ আলী, ২০০৫
(৫২) বাংলাদেশের ইতিহাস, শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, কোলকাতা, ১৩৫২ সন
(৫৩) বাংলাদেশের ইতিহাস- ডঃ মুহম্মদ আবদুল করিম, ১৯৭৭
(৫৪) বাংলাদেশের সুফি সাধক- গোলাম সাকলায়েন, ১৯৮০
(৫৫) বিশ্বনবী- গোলাম মোস্তফা, ১৯৪২
(৫৬) ভারতবর্ষ ও ইসলাম- সুরজিৎ দাশগুপ্ত, কোলকাতা, ১৯৬০
(৫৭) ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, ডক্টর তাঁরা চাঁদ, কোলকাতা, ১৯৮০, অনুবাদ- এস মুহিব উল্লাহ, ১৯৯১
(৫৮) ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস- ড মুহাম্মদ ইনাম উল হক, ২০০৩
(৫৯) ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ, এ বি এম হাবিবুল্লাহ, ২০০৪,
(৬০) ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস- এ. কে. এস. আবদুল আলীম, ১৯৬৯
(৬১) ভারতবর্ষের ইতিহাস- কোকা আন্তোনভা, মস্কো, অনুবাদ- মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কোলকাতা, ১৯৮২
(৬২) মৎসপুরাণম, শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, অনুবাদ- শ্রীযুক্ত পঞ্চকানন তর্করত্ন, কোলকাতা, ১৯৬২
(৬৩) মহাভারত- শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, অনুবাদ- রাজশেখর বসু, ২০১৬
(৬৪) মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস- মওলানা আকরাম খাঁ, ২০০২
(৬৫) মুসলিম সভ্যতার ১০০১ আবিষ্কার, সেলিম এস টি আল হাসানি, অনুবাদ- মিরাজ রহমান ও মো. আবুল বাশার
(৬৬) মুসলিম উম্মার ইতিহাস, মওলানা ইসমাইল রেহান, করাচী, ১৯৯০, অনুবাদ- ২০২১
(৬৭) মুসলিম শরিফ- ইমাম আবুল হোসেইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র), ইরান,

অনুবাদ- হাফেজ মওলানা মুফতি জাকারিয়া, ২০০৮
(৬৮) মুসনাদে আহমদ, আহমদ ইবনে হাম্বল (র), ইরাক, অনুবাদ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮
(৬৯) মেশকাত শরীফ- শায়খ ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ খতিব আততাব্রেজি (র), ৭৩৭ হিজরি, অনুবাদ- মওলানা ফজলুর রহমান, ২০০৭
(৭০) মানচিত্রে বাংলার ইতিহাস- এ কে এম শাহ নাওয়াজ, ২০১১
(৭১) মসলার যুদ্ধ, সত্যেন সেন, কোলকাতা, ১৯৬৮
(৭২) রাসূলের (স) বাণীতে হিন্দুস্থান- জিল্লুর রহমান হাশেমী, ২০১৫,
(৭৩) রামায়ন, বাল্মীকী, অনুবাদ- রাজ শেখর বসু, ২০১৬
(৭৪) রিয়াজ উস সালাতীন- গোলাম হোসায়ন সলীম, মালদহ, ১৭৮৮, অনুবাদ- আকবর উদ্দিন, ঢাকা, ১৯০৪
(৭৫) সীরাতে রাসুলুল্লাহ (স)- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র), মদিনা, অনুবাদ- শহীদ আখন্দ, ১৯৮৭
(৭৬) সীরাতুন নবী (স)- আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম মুআফিরী (র), মিসর, অনুবাদ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪
(৭৭) সীরাত বিশ্বকোষ, সৌদি আরব, ১৯৭৩, অনুবাদ, ঢাকা, ২০১৯
(৭৮) সুনানে নাসাঈ শরীফ, ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইবন শোয়াইব আন নাসাঈ (র), দামেশক, ৩০০ হিজরি, অনুবাদ- মওলানা আবূ নাসের এমদাদউল্লাহ, ঢাকা, ২০১০
(৭৯) সানজাক ই উসমান- প্রিন্স মুহাম্মদ সজল, ২০১৮
(৮০) সিন্ধু থেকে বঙ্গ- মনযূর আহমদ, ২০২১
(৮১) হায়াতুস সাহাব- মওলানা ইউসুফ কান্ধলভী (র), দেওবন্দ, ১৯৮৬, অনুবাদ- মোহাম্মদ যুবায়ের, ১৯৯৯
(৮২) হাদিস শরীফ বাংলা মর্মবাণী, শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, ২০২১
(৮৩) ৬৯ হিজরী সনের মসজিদ ও বাংলাদেশে ইসলাম- চঞ্চল মাহমুদ, ২০১৮

যাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পেয়েছি-

(১) কর্তৃপক্ষ, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা
(২) কর্তৃপক্ষ, মহাস্থানগড় জাদুঘর, বগুড়া
(৩) কর্তৃপক্ষ, জাতি-তাত্ত্বিক জাদুঘর, চট্টগ্রাম
(৪) কর্তৃপক্ষ, তাজহাট জমিদার বাড়ি জাদুঘর, রংপুর
(৫) মসজিদ কমিটি, সাহাবা মসজিদ, লালমনিরহাট
(৬) জনাব আইয়ুব আলী, আবিষ্কারক, সাহাবা মসজিদ, লালমনিরহাট
(৭) জনাব নূরুল আমিন, ইমাম, দেশের সবচেয়ে ছোট মসজিদ, গাইবান্ধা

G-2 G-1





শাহীদুল বারী মামুন

জন্ম- ৬ জুন ১৯৮৮, গাইবান্ধা।

বাবার চাকুরির সুবাদে ছোট থেকে বেড়ে ওঠা ও পড়ালেখা বগুড়ায়। সরকারী আজিজুল হক কলেজ থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং এ স্নাতক এবং সরকারী তিতুমীর কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর করেন। গবেষণা করছেন ইসলামের ইতিহাস এবং মওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (র) লিখিত মসনভি শারীফ নিয়ে। বর্তমানে দেশের অন্যতম স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজে কর্মরত।

প্রকাশিত গ্রন্থ-

(১) রুমির প্রত্যাবর্তন, ২০২২

(২) বাংলায় প্রথম সাহাবী, ২০২৩

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ-

(১) রুমির সান্নিধ্যে ত্রিশ রজনী

(২) ছোটদের মসনভির গল্প

(৩) The Return of Rumi